মাসুদ রানা

অন্ধকারের বন্ধু

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

বৈকাল।

কিছুটা কাস্তে আকৃতির বিখ্যাত সেই হ্রদ। ওটা রাশিয়াতেই, তবে রাশিয়ার এশীয় অংশে। দুনিয়ার সবগুলো হ্রদের মধ্যে গভীরতম স্থানটি–১৬৩৭ মিটার–এই বৈকালেই পাওয়া যাবে।

৩১৫০০ বর্গকিলোমিটারের এত বড় একটা লেকের ধারে গ্রাম, শহর, বন্দর ইত্যাদি কত কিছুই তো থাকবার কথা। আছেও। আর এ-সব জায়গায় স্বভাবতই মানুষজনও আছে প্রচুর। কিন্তু কেউই তারা পরিষ্কার করে বলতে পারল না আসলে কী ঘটেছিল। কিংবা হয়তো যে যা দেখেছে তাই বলছে, তবে সে-সব বিশ্বাস করবার মত নয়।

গোটা লেকে পানির গভীরতা তিন মিটার কমে গেছে। শুধু তাই নয়–শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক–এই বিপুল জলরাশি অদৃশ্য হয়েছে অকস্মাৎ; পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে।

সময়টা একেবারে ভর দুপুর। লেকের পারে জেলেরা মাছ ধরছে। চলাচল করছে বেশ কয়েকটা যাত্রীবাহী লঞ্চ। সীমান্তের ওদিক থেকে আসা একদল মঙ্গোলিয়ান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিয়ে বড়সড় একটা ফেরি লেকের মধ্যভাগ ধরে আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে। ফেরিটা আর দুই মিনিট নিজের পথে থাকতে পারলে জেলেদের এক ডজন ট্রলারকে পাশ কাটাতে পারত।

এরপর কী ঘটল তা ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা জেলেদের কাছ

থেকে জানা যাবে না। কারণ তারা একটা নির্মম প্রলয়কাণ্ডের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। তবে কয়েক মাইল দূরের লোকজন কী দেখেছে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। যদিও তাদের বর্ণনার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া সত্যি দুষ্কর।

লেকের ধারেই বুড়োর বাড়ি, পেশায় জেলে, চোখে তেমন ভাল দেখে না; সে বলল, আকাশ থেকে একটা স্তম্ভ নেমে এসেছিল—কুয়াশার স্তম্ভ, আকারে পাঁচ-সাতটা স্টেডিয়ামকে এক করলে যত বড় হবে তত বড়।

লেকের আরেক পারের তরুণ মাঝি বলল, আকাশের কোথাও, দৃষ্টি সীমার বাইরে, ভিনগ্রহ থেকে আসা একটা সসার লুকিয়ে ছিল; সেই সসারই একটা টানেল তৈরি করে লেকের পানি টেনে নিয়েছে।

দশ মাইল দূরে আকাশে ছিল একটা যাত্রীবাহী প্লেন, তার পাইলট বলল, আকাশ থেকে নামা কুয়াশার স্তম্ভ বা সসার থেকে নামানো টানেল নয়, ওটা ছিল বাষ্প। লোকটা কসম খেয়ে আরও বলল, সেই বিপুল বাষ্পের ভিতর, লেকের সারফেসে, গন্‌গনে আগুন জ্বলতেও দেখেছে সে।

ফেরি আর ট্রলারগুলোর কাছ থেকে মাত্র আড়াই মাইল দূরে ছিল একটা হেলিকপ্টার। হঠাৎ ইউটার্ন নিয়ে ওগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে আসছিল পাইলট, একমাত্র আরোহী একজন বিদেশী ট্যুরিস্টকে নিয়ে। শুধু এরা দুজনেই এত কাছ থেকে ঘটনাটা ঘটতে দেখবার পরও প্রাণে বেঁচে গেছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে বিদেশ থেকে বৈকাল হ্রদ দেখতে এসেছে, ট্যুরিস্টের চোখে বিনকিউলার থাকাটা মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে পিছনের সিটে বসা ট্যুরিস্ট দু'পাঁচ সেকেন্ড পর পর হাতঘড়ির কাঁটায় চোখ রাখলে পাইলটের তা দেখতে পাবার কথা নয়। তাই রাখছিল লোকটা। তারপর হঠাৎ সে বলল, 'তোমাদের বৈকাল হ্রদ দেখা শেষ হয়েছে আমার, কপ্টার ঘোরাও—হোটেলে ফিরে চলো।'

ইউটার্ন নিল পাইলট। ষাট সেকেন্ড পর চমকে উঠল সে।

আসল ঘটনা তার আড়াই মাইল পিছনে ঘটছিল, স্বভাবতই প্রথমে সেটা দেখতে পায়নি। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল লেকের পানি আর পানিতে ভাসমান জলযানগুলো অদ্ভুত আচরণ শুরু করায়।

লেকের পানি কাত হয়ে যাচ্ছে। যেন কোথাও একটা বিশাল ফাঁক বা গর্ত তৈরি হয়েছে, সেটা ভরবার জন্য সগর্জনে ছুটছে চারদিকের বিপুল জলরাশি–ফলে ক্ষিপ্র আর খেপাটে একটা ভাব নিয়ে একই সঙ্গে ছুটছে লঞ্চ, ট্রলার আর নৌকাগুলোও।

তারপর ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে ওঠা একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ। পানি পিছন দিকে ছুটছে, আওয়াজটাও আসছে ওদিক থেকে, তাই কী ঘটছে দেখবার জন্য কপ্টার একটু ঘোরাল পাইলট।

মাইল তিনেক দূরে, লেকের সারফেসে, প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখতে পেল সে। দু'তিনটে স্টেডিয়াম এক করলে যে ব্যাস পাওয়া যাবে, আকারটা তার চেয়ে ছোট নয়। গভীরতাও খুব বেশি হওয়ার কথা, কারণ এত দূর থেকে পাইলট তলাটা দেখতে পাচ্ছে না।

সেই গহ্বরের মাথায় প্রথমে পাইলট বিপুল বাষ্পের মেঘ দেখতে পেল। শুধু লেক নয়, বহুদূর পর্যন্ত আশপাশের এলাকার উপর ছড়িয়ে পড়ল সেই বাষ্প।

পানির প্রবল তোড়ে গহ্বরটার দিকে ছুটছে জলযানগুলো। গহ্বরের কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই ডুবে গেল কয়েকটা।

চোখে বিনকিউলার থাকায় ট্যুরিস্ট লোকটা দেখতে পেল লঞ্চ, ট্রলার আর নৌকার আরোহীরা পাগলামি শুরু করেছে। প্রথমে তাদের মধ্যে দেখা গেল অদ্ভুত এক অস্থিরতা। যেন মনে হলো চারদিক থেকে অদৃশ্য কিছুর তাড়া খেয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। কেউ কেউ টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে পরনের

কাপড়চোপড়। অনেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়ল, যেন একমাত্র পানিতেই শান্তি পাবে।

তখনও অনেক জলযান ডোবেনি, অনেক মানুষ লাফ দেয়নি। সেইসব জলযান আর আরোহীরা পুড়ে যাচ্ছে। প্রথমে ধোঁয়া বেরুতে দেখা গেল—চুল থেকে, কাপড় থেকে; দরজা, ছাদ, পাটাতন, গলুই, বৈঠা থেকেও। তারপর দপ্-দপ্-দপ্-দপ। এক এক করে জ্বলে উঠল প্রতিটি জলযান। প্রতিটি মানুষ হয়ে গেল জ্বলন্ত মশাল ।

'এ আমরা কী দেখছি, সার?' প্রায় কেঁদে উঠে আরোহীর দিকে ঘাড় ফেরাল পাইলট। 'কেয়ামত শুরু হয়ে গেল নাকি?'

ট্যুরিস্ট লোকটা চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে হাঁটুতে রাখা একটা রাইটিং প্যাডে দ্রুত কলম চালাচ্ছে। মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমার জানা মতে আগে কখনও ঘটেনি। লিখে রাখছি—প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে আমেরিকায় মোটা টাকায় বেচতে পারব।' প্রসঙ্গত, নিজেকে আমেরিকান বলেই পরিচয় দিয়েছে লোকটা; তার পাসপোর্টও তাই বলে।

তবে কী কারণে কে জানে আমেরিকা বা অন্য কোন দেশের মিডিয়ায় ওই লোকের কোন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়নি।

বৈকাল হ্রদের পানি হঠাৎ করে কমে গেছে বলে দেশে-বিদেশে হালকা একটা গুজব ছড়াল বটে, তবে সেটা ডালপালা মেলবার সুযোগ পেল না। কথায় যেমন আছে, স্বভাব যায় না ম'লে—রাশিয়ানদের হয়েছে সেই অবস্থা। কমিউনিস্টদের আমলে সমস্ত দুঃসংবাদ হয় লৌহ যবনিকার অন্তরালে চাপা দেওয়া হত, তা না হলে উদোর পিণ্ডি চাপানো হত বুধোর ঘাড়ে; বর্তমান আমলেও সেই একই পন্থা অবলম্বন করা হয়। বৈকাল হ্রদে পানি কমে গেছে, সরকারী বিবৃতিতে এ-কথা স্বীকারই করা হলো না। বলা হলো, স্বাধীনতাকামী মুসলিম চেচেনদের এটা আত্মঘাতী

এবং অন্তর্ঘাতমূলক বর্বরতা; তারা একের পর এক বেশ কিছু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটা ফেরি, কয়েকটা লঞ্চ আর ট্রলার ডুবিয়ে দিয়েছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করে দেখা হচ্ছে।

দুস্কৃতকারীরা আবারও হামলা চালাতে পারে, এই আশঙ্কায় লেকের কিনার থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত লেকে কেউ মাছ ধরবে না, কোন রকম জলযানও চলাচল করবে না।

দু'হপ্তা পরের ঘটনা।

কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় একশো ষাট মাইল উত্তর-পুবে জায়গাটা, তেরেঙ্গানু প্রদেশের ডাঙ্গুর নদীর পাশে মাঝারি আকারের একটা রাবার বাগান।

গাছেরও প্রাণ আছে, কাজেই প্রাণহানি হয়নি বললে ভুল হবে। সময়টা শেষ বিকেল, সূর্য পাটে বসেছে। সুপারভাইজার সিদ্দিক মোল্লার নেতৃত্বে বাংলাদেশী শ্রমিকরা রাবার সংগ্রহের কাজ আজকের মত শেষ করে দু'মাইল দূরের চালাঘরে ফিরে গেছে।

হঠাৎ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল একটা পোড়া গন্ধ।

কী পুড়ছে দেখবার জন্য চালাঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্রমিকরা। ভালই বাতাস বইছে; কিন্তু এ এমনই এক বাতাস, সবাই যেন অদৃশ্য আর উত্তপ্ত একটা পাঁচিলে ধাক্কা খেল।

পড়িমরি করে ছুটে যে-যার ঘরে ফিরে এল সবাই। ঘরের ভিতরও গরম হয়ে উঠল বাতাস। হাঁপাচ্ছে মানুষ, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। কী ঘটছে কেউ বলতে পারছে না। তবে সবাই এক বাক্যে জানাল বাইরে বেরিয়ে কেউ তারা কোথাও আগুনের চিহ্ন মাত্র দেখেনি।

ধীরে ধীরে গরম ভাবটা কেটে গেল। সাহস করে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্রমিকরা। বাতাস আগের চেয়ে জোরে বইছে;

গরম না হলেও, পোড়া গন্ধটা এখন আরও তীব্র। ওই বাগানের দিক থেকেই আসছে।

বাগানে ঢুকে তারা অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল। প্রতিটি গাছের তাজা সবুজ পাতা শুকিয়ে তামাটে আর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে। যেন সচেতনভাবেই নির্দিষ্ট মাত্রার তাপ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে গাছ আর পাতা ধীরে ধীরে শুধু শুকাবে, কিন্তু আগুন লাগবে না।

শুকনো, খসে পড়া পাতা হাতে নিয়ে সামান্য চাপ দিলেই পাঁপরের মত মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে। খানিক আগেও তারা দেখে গেছে পায়ের তলায় মাটি ছিল ভেজা ভেজা, এখন শুকনো খটখট করছে। বিবর্ণ হয়ে গেছে গাছগুলোর সমস্ত ডাল আর প্রতিটি কাণ্ড। এই বাগানের যে দফা শেষ তাতে আর সন্দেহ নেই। একটা গাছও বাঁচবে না।

দশ মাইল দূরের একটা পাহাড় চূড়া থেকে, চোখে বিনকিউলার সেঁটে, সবই দেখল সেই ট্যুরিস্ট লোকটা।

এক হপ্তা পর।

ইন্দোনেশিয়ার ছোট একটা দ্বীপ, নাম নতুনা। দ্বীপটায় শুধু ধান চাষ হয়। গোটা দ্বীপে আনন্দের জোয়ার বইছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ধানের ফলন এবার খুব ভাল হয়েছে। শেষ বিকেলের রোদে খেতের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকজন কৃষক, আনন্দে আর গর্বে ফুলে উঠছে তাদের বুক। বাতাস লাগায় পাকা ধান খেতে একের পর এক ঢেউ উঠছে। তাদের আনন্দ, গর্ব আর আশা-আকাঙ্ক্ষা অকস্মাৎ এক নিমেষে পুড়ে গেল।

কোথাও কিছু নেই, কয়েকশো একর ধান খেত একসঙ্গে জ্বলে উঠল। আগুন লাগবার পর সমস্ত গাছ পুড়ে ছাই হতে দুই কি তিন মিনিট লেগেছে, তার বেশি নয়।

এরপর তিন হপ্তা কেটে গেছে। এই একুশ দিনে আরও দুটো

ঘটনা ঘটল।

মস্কোর কাছাকাছি একটা সাইলোয় আগুন ধরল, ফলে আড়াই লাখ টন গম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আটজন প্রহরীকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। তদন্তের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল শর্ট-সার্কিট কিংবা সিগারেটের অবশিষ্টাংশ থেকে আগুন ধরেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল জার্মানির মিউনিকে।

ছোট, কিন্তু পাথরের তৈরি প্রাচীন একটা জেলখানায় আগুন লাগল। প্রাচীন হলেও, অত্যন্ত মজবুত দালান ওটা। পাথরের পাঁচিলগুলো এত চওড়া, দুজন মানুষ পাশাপাশি দৌড়াতে পারবে। দরজাগুলো কাঠের নয়, লোহার।

কেউ বলতে পারল না কীভাবে লাগল আগুনটা। বলবে কি, কেউ বেঁচে থাকলে তো। কয়েদীরা সবাই ছিল বৃদ্ধ, কারুরই বয়স আশির কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুরুতর সব অপরাধ করবার কারণে আজীবন জেল খাটছিল তারা।

মাত্র পাঁচ মাইল দূরে দমকল বাহিনীর স্টেশন। আগুন লাগবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে খবর পায় তারা। অকুস্থলে পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র সাত মিনিট।

অথচ পাথরের তৈরি জেলখানা, সমস্ত কয়েদী আর প্রহরীসহ, এরই মধ্যে পুড়ে গেছে। দমকল বাহিনী পৌঁছে দেখল পুড়বার আর কিছু বাকি না থাকায় ধ্বংসস্তূপে কোথাও এতটুকু শিখা নেই। আছে শুধু গন্‌গনে আগুন।

সবার মুখেই একটা প্রশ্ন: আগুনের তীব্রতা কত বেশি হলে লোহা আর পাথর এত তাড়াতাড়ি গলে যেতে পারে?

দুটো ঘটনাই দূর থেকে দেখে খসখস করে নোট নিল সেই ট্যুরিস্ট।

এরপর ক্ষতি হলো বাংলাদেশের।

সিঙ্গাপুর থেকে পাঁচ হাজার টন সয়াবিন তেল আর এক হাজার টনের মত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে দেশে ফিরছে বাংলার মুখ। বাংলার মুখ গ্রিস থেকে কেনা একটা পুরানো জাহাজ, আকারে বিশাল; পুরোটাই লোহার তৈরি, কাঠের ব্যবহার খুবই কম।

ভারত মহাসাগরকে পিছনে ফেলে বঙ্গোপসাগরে ঢুকছে জাহাজ। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। দুপুরবেলার রোদ তাই খুব কড়া। তবে সাগর একদম শান্ত—আয়নার মত মসৃণ।

পাশে সেকেন্ড অফিসারকে নিয়ে ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপটেন শেখ জয়ী লুৎফর।

'সার,' চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে সেকেন্ড অফিসার সাযযাদ সহাস্যে বললেন, 'চারপাশে আর কোন জাহাজ নেই, দিগন্তের কাছে শুধু একটা হেলিকপ্টার আছে।'

'কে বলল জাহাজ নেই?' ক্যাপটেনও সহাস্যে জবাব দিলেন, জানেন এটা একটা কথার কথা বলছেন সেকেন্ড অফিসার। কন্ট্রোল প্যানেলের মাঝখানে বসানো রেইডার ডিসপ্লে-র দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'পিছনে তিন তিনটে জাহাজ রয়েছে—সম্ভবত বোম্বে, করাচী আর কলম্বো থেকে আসছে। সামনেও কয়েকটা আছে।'

দুজনেই জানেন যে ওদের চারপাশের সবগুলো জাহাজই কমপক্ষে আঠারো মাইল দূরে রয়েছে, আর দেখতে না পাওয়ার সেটাই কারণ।

অদ্ভুত জিনিসটা উত্তর দিক থেকে এল। সেকেন্ড অফিসারের চোখে এই মুহূর্তে বিনকিউলার নেই, বোধহয় সেজন্যই দেখতে পেলেন তিনি; তা না হলে তাঁর দৃষ্টি থাকত অনেক দূরে।

মাত্র দুশো গজ সামনে থেকে এল ওটা। এল বললে শুনতে কেমন যেন লাগে, কিন্তু অন্য কোন ভাবে বর্ণনা করা কঠিন। নীল, মসৃণ সাগর দেড় কি দু'হাজার বর্গগজ জায়গা জুড়ে টগবগ

করে ফুটছে। বৃত্তাকার একটা আয়তন। ছুটে আসছে সবেগে–মাথায় রাশি রাশি বাষ্পের মেঘ নিয়ে। সেকেন্ড অফিসার দেখলেন, অথচ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না–বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে একটা গহ্বর তৈরি হয়েছে।

গহ্বরের কিনারার পানি ফুটছে, আর গভীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে ঘন বাষ্প।

'সার!' তাঁর গলা থেকে এই একটা মাত্র আওয়াজ বেরুতে পারল।

ক্যাপটেন জয়ী লুৎফর তখনও রেইডার ডিসপ্লে দেখছেন। সেকেন্ড অফিসারের ডাক তাঁর কানে গেল, কিন্তু মুখ তুলে তাকাবার সময়টুকুও তিনি পেলেন না।

টগবগ করে ফুটন্ত পানির সচল কিনারা বাংলার মুখকে স্পর্শ করল। ব্রিজ আর আপার ডেকে যারা ছিলেন, চোখের নিমেষে বাষ্প হয়ে উড়ে গেলেন। একই সঙ্গে গলে গেল সমস্ত লোহা আর ইস্পাত। গহ্বরের ভিতর পড়বার সময়ও পেল না জাহাজ, তাপের অবিশ্বাস্য প্রচণ্ডতা এমনভাবে গ্রাস করল, ওটা যেন বিশ হাজার টনী কোন জাহাজ নয়, স্রেফ তরল পদার্থ–এই ছিল, এই নেই, ডুবে গেল ফুটন্ত পানির নীচে।

বাংলার মুখ অস্তিত্ব হারাবার পর দিগন্তে ঝুলে থাকা হেলিকপ্টারটি আর দেরি করেনি, বাঁক নিয়ে চলে গেছে আরেক দিকে।

কোন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেল না, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাল বাংলার মুখ মাঝ সাগর থেকে নিখোঁজ হয়েছে।

দুই

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

ইন্টারকমে জরুরি তলব। মাসুদ রানাকে এই মুহূর্তে দরকার। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান ওর জন্য তাঁর চেম্বারে অপেক্ষা করছেন।

'কিন্তু, ইলোরা,' রানার প্রাইভেট সেক্রেটারি কাকলি একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল, 'মাসুদ ভাই তো এখনও অফিসেই আসেননি।'

'সেটা জানি বলেই তো মেসেজটা তোমাকে দিলাম,' ইন্টারকমের অপরপ্রান্ত থেকে ইলোরার কাঠকাঠ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'রানা এলেই পাঠিয়ে দেবে।'

এই সময় প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠল কাকলি। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

ঝট করে ঘুরতেই দোরগোড়ায় যেন একজন দেবদূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কাকলি; চেনে অথচ যেন চেনে না। দেবদূত মনে হলেও, চলনে বলনে ভারী স্মার্ট আর আধুনিক। কাকলি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল, মেয়েদের আর কী দোষ, তারা তো ওর মায়াবী রূপ আর মোহনীয় ভাবভঙ্গি দেখে পাগল হবেই। তারপর নিজের কথা ভাবল সে: হায়, কেউ কোনদিন জানতে পারবে না, প্রতিদিন একটু একটু করে খুন হয়ে যাচ্ছি আমি। এ হলো কাছাকাছি থেকেও না পাওয়ার অভিশাপ। এক

সঙ্গে কাজ করো, কিন্তু লোভ করতে পারবে না–অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আছে।

এ-সব চিন্তা মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ডের মধ্যে খেলে গেল কাকলির মাথায়। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল সে। 'মাসুদ ভাই,' তাড়াতাড়ি বলল, 'ইলোরা ফোন করে বলল, বস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন··· জরুরি ··· ।'

রানার বুক ধক্ করে উঠল। জরুরি ডাক? তা হলে নিশ্চয়ই কোন অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া যাবে। বিপদ আর রোমাঞ্চের আগাম আভাস পেয়ে রক্তে অ্যাড্রেনালিনের মাত্রা বেড়ে গেল হঠাৎ।

তবে কাকলির অনুসন্ধানী আর কৌতূহলী দৃষ্টি রানার বিশেষ পছন্দ হলো না; ভাবটা যেন, বসের জরুরি তলব পেয়ে ও কেমন কুঁকড়ে যায়, এটা চাক্ষুষ করবার জন্য অপেক্ষায় আছে।

'ওই ডাইনী ইলোরা আর আমাদের বুড়ো বসকে তুমি চেনো না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল রানা। 'কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, মানুষকে তটস্থ করে রাখা ওদের একটা ভারী বদ স্বভাব।'

কাকলি কিছু বলবার আগেই ইন্টারকম জ্যান্ত হয়ে উঠল: 'রানা?' এবার স্বয়ং রাহাত খানের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আমি তোমাকে ডেকেছি।'

মুখ থেকে সব রক্ত নেমে গেল, গলা শুকিয়ে কাঠ, যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে এসে ইন্টারকমের সামনে মুখ নামিয়ে কোন রকমে বলল, 'জী, সার। আমি···'

'তা হলে আসছ না কেন? আর আজেবাজে কথা বলবার আগে ইন্টারকম বন্ধ করতে পারো না?'

যোগাযোগ কেটে যাওয়ার আওয়াজ শুনে সিধে হলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে কাকলির দিকে তাকাল। 'তুমি ওটা বন্ধ করোনি কেন?'

'এমনভাবে চমকে দিলে, সময় পেলাম কখন?' নরম সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল কাকলি।

'তুমি বললে ইলোরা মেসেজটা দিয়েছিল। তা হলে বস্ কীভাবে আমার কথা শুনতে পেলেন?' ভয়ানক নার্ভাস রানা। না জানি কি আছে আজ কপালে!

'আমি কী করে জানব যে ইলোরা বসের চেম্বার থেকে ফোন করেছে–নিশ্চয়ই তাই করেছে, তা না হলে...' চোখ তুলে থেমে গেল কাকলি, কারণ কামরা ছেড়ে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে মানুষটা।

সিঁড়ি ভেঙে ছয়তলায় উঠে এল রানা। করিডর পার হয়ে শেষ মাথার দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

ইন্টারকমে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে ইলোরা, চোখ ইশারায় চেম্বারের দরজাটা দেখিয়ে দিল রানাকে, ভাব দেখে মনে হলো না রানার বিপদ সম্পর্কে সচেতন।

একটা ঢোক গিলে চেম্বারের দরজায় নক করল রানা। আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবার চেষ্টা বিশেষ সফল হচ্ছে না, তবে সেটা অন্তরে; বাইরের চেহারা দেখে বুঝবার কোন উপায় নেই যে শুকিয়ে গেছে ওর কলজেটা।

'কাম ইন,' ভারী আওয়াজটা যেন দূর থেকে ভেসে এল।

দুরু দুরু বুকে ভিতরে ঢুকে রানা দেখল বস্ তাঁর রিভলভিং চেয়ারে নেই।

'এদিকে এসো,' কামরার ডান দিক থেকে বললেন রাহাত খান।

চেম্বারের ওদিকের দেয়ালে প্রায় পুরোটা জুড়েই মানচিত্র টাঙানো। মানচিত্রের পাশে বড়সড় একটা কমপিউটার মনিটরও আছে; মানচিত্রের কোন বিশেষ অংশ বড় করে দেখতে চাইলে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে মনিটরে তা দেখা সম্ভব। এই কমপিউটারের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইটেরও সংযোগ আছে। হাতে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা নিয়ে ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে

রয়েছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

সাবধানে এগিয়ে এসে বসের পাশে, সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রেখে, দাঁড়াল রানা। মনিটরে চোখ পড়তে মরুভূমি দেখতে পেল। সম্ভবত নেগেভ।

নেগেভ মরুভূমি ইজরায়েলে।

হার্টবিট একটু বেড়ে গেল রানার। ইন্টারকম কেলেঙ্কারির কথা বেমালুম ভুলে গেছে।

'চিনতে পারছ?' জানতে চাইলেন বস্।

'জী, সার। নেগেভ মরুভূমি।'

'এই জায়গা দুটো দেখো,' পালা করে একজোড়া লাল বিন্দুর দিকে পয়েন্টার তাক করলেন বিসিআই চিফ। দুটোর মাঝখানে দূরত্ব প্রায় দেড়শো মাইল। জায়গা দুটোর নাম আইয়াম আর নাজাফি। 'কিছু স্মরণ করতে পারো?'

'আইয়াম...নাজাফি...' মনে মনে আওড়াচ্ছে রানা, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না জায়গা দুটোর কী বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য।

বসকে একটু গম্ভীর আর অসন্তুষ্ট দেখাল। 'স্মরণশক্তি কী ভাবে বাড়ানো যায়, সে চেষ্টা করো,' বলে ঘুরলেন, ডেস্কের দিকে ফিরে যাচ্ছেন। 'এসো।'

অনুগত মেষ শাবকের মত পিছু নিল রানা।

ডেস্ক ঘুরে এসে নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসলেন রাহাত খান, বসেই পাইপে সুগন্ধি তামাক ভরবার কাজে মন দিয়েছেন। 'বসো।'

একটা আর্ম-চেয়ারে বসল রানা।

'কী সব ঘটছে খেয়াল করছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন বস্। 'শুরুটা হয়েছিল বোধহয় বৈকাল হ্রদ থেকে। এত তাপ কোত্থেকে আসছে?'

রানা অথৈ সাগরে, একেবারে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা।

বৈকাল হ্রদে চেচেন গেরিলারা বিস্ফোরকের সাহায্যে কয়েকটা লঞ্চ আর একটা ফেরি ডুবিয়ে দিয়েছে, মাস দেড়-দুই আগে এটা খবরের কাগজে পড়েছে ও। কিন্তু তার সঙ্গে তাপের কী সম্পর্ক? তাপ...তাপ...তারপরই ঝট করে মনে পড়ে গেল। বেশ কয়েকটা খবর ছাপা হয়েছে কাগজে, কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটার কী সম্পর্ক ওর জানা নেই।

মালয়েশিয়ায় রাবার বাগান পুড়ে গেছে, ইন্দোনেশিয়ায় পুড়েছে ধানখেত, আগুন লেগেছে রুশ খাদ্য গুদামে আর জার্মানির একটা জেলখানায়।

বস্ বলছেন, এত তাপ কোত্থেকে আসছে। মাই গড! এ-সব কি তা হলে এক সুতোয় গাঁথা? দুর্ঘটনা নয়, স্যাবটাজ? 'জী, সার,' সাবধানে বলল ও, 'মনে পড়েছে। কিন্তু বৈকালের ঘটনাটা তো চেচেনদের...'

'ওটা রুশ সরকারের ভাষ্য, জনগণের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছে,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'আমাদের কাছে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে, ওটাও আসলে একটা স্যাবটাজের ঘটনা ছিল। কে বা কারা প্রচণ্ড উত্তাপ ব্যবহার করেছে।'

'উত্তাপ... কীভাবে, সার?'

'সেটাই তোমাকে জানতে হবে,' পাইপে আগুন ধরালেন বিসিআই চিফ। 'আমাদের গায়েও যখন আঁচ লেগেছে, আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারি না।'

'সার?' রানা শুধু বিস্মিত নয়, ওর চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল।

মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন রাহাত খান। 'বাংলার মুখ।'

'কিন্তু ওটা তো, সার, মাঝ সাগর থেকে নিখোঁজ...' বসকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল রানা।

'চট্টগ্রাম বন্দরের রেইডার থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছে ওটা,'

বললেন তিনি। 'ওই সময় রেইডারে একটা হেলিকপ্টারও ছিল।'

যোগাযোগটা কী বা কোথায়, ধরতে না পারায় গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে রানার কাছে।

'শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি একটা জাহাজে ল্যান্ড করে ওই কপ্টার,' বললেন রাহাত খান। 'জাহাজটা লোহিত সাগরের দিকে চলে যায়।'

'লোহিত সাগর...'

'তার আগে সর্বশেষ হামলাটা সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।'

এরপর বস্ যা বললেন, গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে গেল রানা:

দিন কয়েক আগের এক সকাল। ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত। দু'দেশের সৈন্য, ট্যাংক, আর্মারড্ ভেহিকেল, মর্টার, রকেট লঞ্চার, মেশিন গান, রাইফেল, গ্রেনেড ইত্যাদি নিয়ে মুখোমুখি পজিশন নিয়ে আছে।

এটা রোজকার পরিচিত একটা দৃশ্য। দু'পক্ষই পরস্পরের রুটিন কাজ-কর্ম সম্পর্কে জানে। নতুন ট্রেঞ্চ কাটা শুরু হলে বা সৈন্য সংখ্যা বাড়ছে দেখলে প্রতিপক্ষ ধরে নেয় হামলা হতে যাচ্ছে। তখন তারাও প্রস্তুত হয়।

সেদিন সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যেটাকে কোন রুটিনের মধ্যে ফেলা গেল না।

সকাল ছ'টায় ইজরায়েলি সৈন্যদের পালাবদল শেষ হয়েছে। তার এক ঘণ্টা পর ওই একই কাজ শেষ করেছে লেবাননী সৈন্যরা। তারপর, ন'টার দিকে, লেবাননী পক্ষ বিস্মিত হয়ে দেখল—যে যার কাভার ছেড়ে ইজরায়েলি সৈন্যরা পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু যে সৈন্য, তা নয়—ট্যাংক, আর্মারড্ ভেহিকেল, চাকার উপর বসানো রকেট লঞ্চার আর মেশিন গানও প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ইজরায়েলিরা।

সীমান্ত এভাবে অরক্ষিত রেখে ইজরায়েলিরা ফিরে যাচ্ছে

কেন? লেবাননী কর্নেল জয়নাল জিলানি ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। ইজরায়েলিদের উদ্দেশ্য বোঝা না গেলেও, সেটা যে শুভ বা মহৎ কিছু নয়, এ-ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ।

কমান্ডারদের ডেকে টহল আর প্রহরা আরও জোরদার করবার নির্দেশ দিলেন কর্নেল জিলানি। কালবিলম্ব না করে আর্মি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গেও যোগাযোগ করলেন। কী ঘটছে রিপোর্ট করে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন তিনি।

মাত্র পাঁচ মিনিট হয়েছে সীমান্ত ত্যাগ করে ফিরে গেছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। কর্নেল জিলানি ফিল্ড-টেলিফোনে আর্মি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে এখনও কথা বলছেন। এই সময় চোখের নিমেষে সব কিছুতে আগুন ধরে গেল।

লেবাননী সীমান্ত চৌকিতে যা কিছু ছিল—সৈন্য, ট্যাংক, আর্মারড্ ভেহিকেল, মেশিন গান, রকেট লঞ্চার, আধ মাইল পিছনের অ্যামিউনিশন ডিপো—হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল, নয়তো বিস্ফোরিত হয়ে উড়ে গেল।

আর্মি হেডকোয়ার্টার সংশ্লিষ্ট সীমান্ত চৌকির সঙ্গে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে নতুন একদল সৈন্যকে পাঠাল। অকুস্থলে পৌঁছাতে দু'ঘণ্টা সময় লাগল তাদের। চারদিক দেখে কী ঘটে গেছে, কীভাবে ঘটেছে, কিছুই তাদের মাথায় ঢুকল না।

তারা রিপোর্ট করল: 'সাড়ে তিনশো সৈনিক আর অফিসার পুড়ে স্রেফ ছাই হয়ে গেছে...আর ধারণা করা হচ্ছে সমস্ত হার্ডঅয়্যার গলে গিয়েছিল...ইজরায়েলি সৈন্যরা হঠাৎ প্রচণ্ড গরম অনুভব করায় সীমান্ত ছেড়ে পালায়। অন্তত এ-কথাই বলছে...তারা ফিরে আসে আমরা এখানে পৌঁছানোর আধ ঘণ্টা পর...'

বসের মুখে ঘটনাটা শুনে রানা মন্তব্য করল, 'পরিষ্কার বোঝা যায়, ইজরায়েলি সৈন্যরা জানত বিপদ একটা আসছে। সার, ওদের এলাকার কোন ক্ষতি হয়নি?'

‘না,’ বললেন রাহাত খান। ‘আমার ধারণা, ওরা সরে গিয়েছিল স্রেফ ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে। একবার চিন্তা করে দেখো, অস্ত্রটা কী রকম কাজের জিনিস।’

‘অস্ত্র, সার?’ রানা প্রায় হকচকিয়ে গেল।

‘এতক্ষণ তা হলে কী বুঝলে?’ রাগী হেডমাস্টার মনে হলো রাহাত খানকে। ‘প্রচণ্ড উত্তাপ দিয়ে খেত, সাইলো, জাহাজ, সৈন্য আর ট্যাংকসহ সীমান্ত চৌকি ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এই তাপ কোনও অস্ত্র থেকে আসছে না?’

এই মুহূর্তে বোবা মনে হলো রানাকে, নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল।

‘প্রতিটি ক্ষেত্রে, খেয়াল করো, একটা নির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত করা হয়েছে। অস্ত্রটার বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানে আঘাত করতে চায় ঠিক সেখানেই লাগে—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।’

‘তারমানে কি ইজরায়েল এরকম একটা অস্ত্র বানিয়েছে?’ জানতে চাইল রানা।

‘আমেরিকানদের সাহায্য নিয়ে তা যদি ওরা বানিয়ে থাকে, আমি মোটেও আশ্চর্য হব না।’ বিসিআই চিফ গম্ভীর হলেন। ‘ওদের নেগেভ মরুভূমির ওপর সেজন্যেই চোখ বুলাচ্ছিলাম। মনে নেই, বছর তিনেক আগে ইজরায়েলিরা...’

‘জী, সার,’ হঠাৎ বলল রানা, ‘মনে পড়েছে। আমেরিকানরা নেগেভের আইয়ামে একটা মিলিটারি এয়ার বেইস তৈরি করবার ঘোষণা দিয়েছিল। আর ইজরায়েল বলেছিল, নাজাফিতে তারা একটা রকেট লঞ্চিং ফ্যাসিলিটি গড়ে তুলবে।’ ওর আরও মনে পড়ল, তখন ব্যাপারটা নিয়ে খুব হাসাহাসিও হয়েছিল। ইহুদিরা জানে প্যালেস্টাইন সহ দুনিয়ার কোথাও তারা টিকতে পারবে না, তাই নাজাফিতে স্পেস সেন্টার তৈরি করছে, ভবিষ্যতে যাতে মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে পারে—এ-ধরনের সব কৌতুক শোনা গেছে।

রাহাত খান জানালেন, আসলে ওই দুই জায়গায় ঠিক কী

বানানো হয়েছে কেউ তা জানে না।

তবে তাঁর কানে এসেছে—নাজাফিতে রকেট, বেলুন, মিসাইল ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা চালায় ইজরায়েলিরা। আর আমেরিকানরা মঙ্গলগ্রহে মানুষ পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে আইয়ামে। এ-সব কতটুকু সত্যি বলা মুশকিল, স্যাটেলাইট জ্যামিং করায় নেগেভের কোন ছবিই সংগ্রহ করা যায় না।

'ওরা আসলে কী করছে, অস্ত্রটা ইজরায়েলিরা বানিয়েছে নাকি আমেরিকানরা, সব ওখানে গিয়েই জানতে হবে তোমাকে,' সবশেষে বললেন রাহাত খান।

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা আসলে কী হতে পারে, সার? লেযার গান?'

'আমার কোন ধারণা নেই। এক দিক থেকে এটা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর। যে বিপদ কোত্থেকে আসছে ধরা যায় না, তার জন্যে তুমি কাকে দায়ী করবে?'

রক্তে যতই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার নেশা থাকুক, এবারের অ্যাসাইনমেন্টটা যে খুব শক্ত, সেটা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারছে রানা। 'সার, ওই একটাই তা হলে সূত্র? লেবাননী সীমান্ত চৌকি আক্রান্ত হবার ঠিক আগে ইজরায়েলি সৈন্যরা সরে গিয়েছিল? কিন্তু আমরা যদি ভুল অর্থ করে থাকি, আমার নেগেভে যাওয়াটা বৃথা হয়ে যাবে না?'

'না, আমরা ভুল অর্থ করিনি। প্রমাণ আছে, অন্তত দুটো ঘটনার সঙ্গে মোসাদ জড়িত।'

রানা অপেক্ষা করছে।

পাইপে নতুন করে তামাক ভরছেন রাহাত খান। 'তখন কি বললাম মনে আছে? কপ্টার ল্যান্ড করার পর জাহাজটা লোহিত সাগরের দিকে চলে যায়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জী।'

'সুয়েজ খাল পার হয়ে হাইফা বন্দরে ভিড়েছে জাহাজটা।'

পাইপে টান দিতে গিয়েও দিলেন না বিসিআই চিফ, হাতটা নামিয়ে নিলেন। 'বৈকাল হ্রদেও একটা চার্টার করা হেলিকপ্টার ছিল,' ধীরে ধীরে বললেন। 'কপ্টারের পাইলট আমেরিকান এক ট্যুরিস্টকে লেক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ট্যুরিস্ট লোকটার আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় চেহারাটা মনে গেঁথে রাখে সে। বিসিআই-এর একজন এজেন্ট তাকে দিয়ে লোকটার চেহারা আঁকিয়ে নিয়েছে।' দেরাজ খুলে একটা এনভেলাপ বের করে রানার দিকে ঠেলে দিলেন।

এনভেলাপ খুলে স্কেচটায় চোখ রাখল রানা। বোঝা যায়, ঢাকায় এটা পাঠানো হয়েছে ফ্যাক্স করে। চেহারাটা চিনতে দু'সেকেন্ড দেরি হলো ওর। তবে চিনবার পর মনে কোন সন্দেহ থাকল না যে এই লোক অবশ্যই এবরান বারাইদি।

মেজর এবরান বারাইদি দুর্ধর্ষ মোসাদ এজেন্ট। প্রথম ইজরায়েলি এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিল সে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নাসার সহযোগিতায় অ্যাস্ট্রনট হওয়ার ট্রেনিং নেয়। পরে যোগ দেয় মোসাদে।

বেশ কয়েকবারই পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে ওরা, কোনবারই কেউ জেতেনি বা হারেনি—কখনও রানা তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে এসেছে, কখনও বারাইদি ওকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে; চেষ্টা করেছে দু'জনেই, কিন্তু কেউ কাউকে শেষ করতে পারেনি।

চোখ তুলে বসের দিকে তাকাল রানা। 'এবরান বারাইদি, সার।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'ইজরায়েলে ঢোকার পর যে-সব কাগজ-পত্র লাগবে, বেশির ভাগই তৈরি করা হয়েছে,' বললেন তিনি। 'ইলোরার কাছ থেকে ব্রিফকেসটা চেয়ে নাও। ওটায় অন্যান্য আরও কিছু তথ্য আছে।' চোখ নামিয়ে একটা ফাইল টেনে নিলেন। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার তুমি আসতে

পারো।’

বসের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে চেয়ার ছাড়বার সময় বুকে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করল রানা; ইজরায়েল চিরকালই সবচেয়ে বিপজ্জনক রণক্ষেত্র ওর, প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবার জন্য প্রতিবারই সাহস আর বুদ্ধির সঙ্গে ভাগ্যের সহায়তাও দরকার হয়েছে। মনে মনে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল ও, ‘এবার ফিরে আসতে পারব তো, সার?’

কে জানে কী হবে এবার!

তিন

রঙচটা এই ডিসি-থ্রি প্লেনটা এতই পুরানো আর নড়বড়ে, রানার ভয় হচ্ছে সমস্ত কলকব্জা না খুলে পড়ে যায়।

হাতঘড়ি দেখল। রাত বারোটা এক মিনিট। মাত্র ষাট সেকেন্ড আগে সমস্ত আলো নিভিয়ে চোরের মত সীমান্ত পার হয়ে ইজরায়েলে ঢুকেছে ওরা।

প্লেন এই মুহূর্তে ত্রিশ হাজার ফুট উপরে। এখন থেকে ঠিক সতেরো মিনিট পর, সীমান্ত থেকে ইজরায়েলের পঞ্চাশ মাইল ভিতরে পৌঁছে, গোত্তা খেয়ে বিশ হাজার ফুট নীচে নামবে জর্দানি পাইলট সালামাত হাবিবি।

প্যারাশুট নিয়ে নেগেভ মরুভূমিতে নামতে যাচ্ছে রানা। নাজাফি থেকে যথেষ্ট দূরে, ওটার কাছাকাছি শহর তুফা ওর প্রথম গন্তব্য। পাইলটকে দেখতে বলা হয়েছে, রানা যাতে তুফা শহরের

পুবদিকের উপত্যকায়, খেজুর বাগানের ভিতর নামতে পারে।

তুফা শহরে একজন প্যালেস্টাইনি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ওকে খুঁজে নেবে। রানা শুধু তার কোড নাম্বার জানে। তুফার উত্তরে একটা মেশিন-টুলস্ ফ্যাকটরি আছে, সিক্সটিনাইন ওখানকার একজন মেকানিকাল ডিজাইনার। সে-ই তুফা থেকে পথ দেখাবে ওকে, নাজাফি সম্পর্কে তথ্য দেবে, প্রয়োজন হলে ওখানকার ইজরায়েলি ফ্যাসিলিটিতে পৌঁছেও দিয়ে আসবে।

ইলোরার কাছ থেকে ছোট আকারের, অত্যন্ত পুরানো একটা ব্রিফকেস পেয়েছে রানা। তাতে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র, ফলস বটমে কিছু অস্ত্র, মখমলের উপর সাজানো প্রচুর মণি-মাণিক্য ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আছে। সে রকম একটা তথ্য হলো: সিক্সটিনাইন বিসিআই-এর হয়ে আগেও কাজ করেছে।

রানার সঙ্গে একটা ব্যাক-প্যাক আছে, তারপরও ব্রিফকেসটা সঙ্গে নিতে হবে।

'আর দশ মিনিট, মিস্টার রানা,' বলল হাবিবি। 'আপনার জন্যে দোয়া করি, সার। যান, শালাদের কচুকাটা করে আসুন।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখবার নেই। প্লেন বাঁক নিয়ে নীচে নামছে, ফলে নড়বড়ে নাট-বল্টুগুলো আরও বেশি আপত্তি জানাতে শুরু করল—কর্কশ আওয়াজে কান পাতা দায়।

সিট ছেড়ে প্যারাশুট পরছে রানা, পাইলটের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল একবার। ভাবল, ভয়ানক দুঃসাহসী না হলে এরকম ঝুঁকি কেউ নেয় না। তবে শুধু দুঃসাহস নয়, মার্কিনীদের প্রতি ইরাকীদের যেমন, ঠিক তেমনি ইজরায়েলিদের প্রতি এদের তীব্র ঘৃণারও বিরাট ভূমিকা আছে।

জনমতের তোয়াক্কা না করে জর্দানের বাদশা আর সরকার আমেরিকার বন্ধু থাকতে চায়, তাই তারা এমন কিছু করবে না যাতে ইজরায়েলি স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এটা জানা কথা, তাই বিসিআই

জর্দানের কাছে সরকারী পর্যায়ে কোন সাহায্য চায়নি। তবে সাহায্য যেহেতু দরকার, সেটা চাওয়া হয়েছে ব্যক্তি পর্যায়ে।

ভদ্রলোক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) তাহির জাকারিয়া। মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের চিফ ছিলেন, তিন বছর হলো অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে আম্মানের সফল একজন ব্যবসায়ী তিনি।

তাঁর ব্যবসার সংখ্যা কম নয়, তবে সবচেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছে বোরাক নামে এয়ার লাইন্স কোম্পানিটি।

মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে দায়িত্ব পালনের সময় যখনই কোন সংকটে পড়ে বিসিআই-এর সাহায্য চেয়েছেন, একবারও বিমুখ হতে হয়নি তাঁকে। সে কথা তিনি ভোলেননি, তাই বিসিআই-এর অনুরোধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান।

গোপনীয়তার স্বার্থে বিশ্বস্ত পাইলট সালামত হাবিবিকে বেছে নিয়েছেন জেনারেল জাকারিয়া। ইজরায়েলিদের ক্ষতি করবার সুযোগ পেলে এই লোক বিনা দ্বিধায় জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নেবে। কিন্তু একটা কথা তাঁর জানা নেই, হাবিবির একটা দোষ হলো ইজরায়েলিদের প্রতি নিজের ঘৃণার কথা সে চেপে রাখবার চেষ্টা করে না। প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ পাওয়া গেছে, এই কথাটাও তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়। আর কে না জানে যে কান ছাড়া দেওয়াল নেই!

পুরানো একটা ডিসি-থ্রি মাঝে মধ্যে ট্রেনিং-এর কাজে ব্যবহার করা হয়, কাজেই ওটাকে টেক-অফ করতে দেখলে কারও মনে কোন সন্দেহ জাগবে না; জেনারেল সিদ্ধান্ত নেন, ওটাই বিসিআই এজেন্টকে নেগেভের ড্রপ জোন-এ পৌঁছে দিয়ে আসবে।

'আমরা ড্রপ জোনে, মিস্টার রানা,' বলল হাবিবি। 'তবে বাতাস খুব বেশি। আপনি রেডি তো?'

প্যারাশুটের শেষ বাকলটা ঠিকমত আটকেছে কি না দেখে নিয়ে মাথা ঝাঁকাতে যাবে রানা, প্লেন অকস্মাৎ কাত হয়ে পড়ল।

দেয়ালে ধাক্কা খেল ও। বাইরে তাকাতে দেখল ফ্লেক্সিবল্ উইং আহত আলব্যাট্রস-এর ডানার মত ঘনঘন উপর-নীচে ঝাপটাচ্ছে।

হাবিবি প্লেনটাকে আরেক দিকে কাত করল। ফলে আবার ভারসাম্য হারাল রানা। এবার কোন দেয়াল নয়, খোলা দরজার দিকে ছিটকে পড়ল ও।

এখানেই যখন পড়তে হবে, নিজেকে থামাবার কোন চেষ্টাই করল না রানা, খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সিদ্ধান্তটায় অবশ্যই ভাগ্যের সহায়তা ছিল। প্লেন ত্যাগ করবার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা হাই ভেলোসিটি সারফেস-টু-এয়ার মিসাইলকে ধোঁয়ার ট্রেইল তৈরি করে উপর দিকে উঠে যেতে দেখল রানা।

যেভাবেই হোক, জর্দানী পাইলট ইজরায়েলি রাডার নেটওঅর্ককে ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ডিসি-থ্রিকে দেখামাত্র মিসাইল ছুঁড়েছে তারা।

প্লেনের বাম ডানা ছুঁয়ে গেল মিসাইল, তারপর যেন সূর্যের চেয়ে কোটি গুণ উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে বিস্ফোরিত হলো একটা নক্ষত্র। শব্দ, তাপ আর বিস্ফোরণের ধাক্কা খেল রানা; শূন্যে পাক খাচ্ছে শরীরটা।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় প্রাণে বেঁচে গেল রানা। ওই সময় যদি প্যারাশুট খুলত, ডিসি-থ্রির ফুয়েল ট্যাংকের বিস্ফোরণ আগুন ধরিয়ে দিত ওটায়। তার বদলে উত্তপ্ত বাতাসের ঢেউ পাশ কাটাল ওকে, ভারী জ্যাকেটের কয়েক জায়গায় শুধু খুদে দু'তিনটে আগুন জ্বলল।

শক্তি খাটিয়ে শরীরের পাক আর ডিগবাজি খাওয়া বন্ধ করল রানা, হাত দিয়ে চাপড় মেরে খুদে শিখাগুলো নিভাল। তারপর রিপকর্ড ধরে দিল হ্যাঁচকা এক টান।

পাহাড়ী ঢাল থেকে এক হাজার ফুট উপরে খুলল প্যারাশুট। তীব্র বাতাস ওকে দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। প্রচণ্ড

ঝাঁকি লাগায় ফুসফুস প্রায় খালি হয়ে গেছে রানার।

শেষবারের মত একটা ডিগবাজি খেয়ে পাহাড়ের চূড়া টপকে অপর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল জ্বলন্ত প্লেনটা। ক্ষণস্থায়ী, তবে তীব্র একটা মর্মবেদনা অনুভব করল রানা পাইলটের জন্য।

নরম, ভেজা ভেজা মাটিতে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল রানা। স্থির হলো একটা খেজুর গাছের গোড়ায়। ড্রপ জোন থেকে সম্ভবত মাইল কয়েক দূরে নেমেছে ও।

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। আকাশে প্রচুর তারা; দৃষ্টিসীমার ভিতর চাঁদ, মেঘ বা অন্য কিছু নেই।

দম ফিরে পেয়ে গা থেকে বাকল্ আর স্ট্র্যাপগুলো খুলল। প্যারাশুট জড়ো করে নরম মাটি খুঁড়তে বেশি সময় নিল না, তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলল ওটা, তারপর ঘাসের চাপড়া আর পাতা ছড়িয়ে ঢেকে দিল জায়গাটা।

ইজরায়েলি সৈন্যরা মিসাইল ছুঁড়ে প্লেনটাকে যখন ফেলে দিয়েছে, ধরে নিতে হয় রানাকেও তারা জাম্প করতে দেখেছে। আর অন্ধকারে যদি জাম্প করতে না-ও দেখে থাকে, ডিসি-থ্রির ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হওয়ার সময় আলোর কোন কমতি ছিল না আকাশে, প্যারাশুটের নীচে নিশ্চয়ই ঝুলে থাকতে দেখা গেছে ওকে।

ইজরায়েলের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই রানা সম্ভবত শত্রুর চোখে ধরা পড়ে গেছে।

এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে ওকে।

অন্ধকার খেজুর বাগানের কোথাও কোন শব্দ নেই। একজোড়া খেজুর গাছের কাছে সরে এসে ব্যাকপ্যাক খুলে ছদ্মবেশ নিল রানা। সঙ্গে ছোট্ট আয়না আর পেন্সিল টর্চ আছে, চাপ দাড়ি আর কাধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়া চুল ভাল ভাবেই অ্যাডজাস্ট করা গেল। জ্যাকেট আর ট্রাউজারের উপর ঢোলা আর খানিকটা নোংরা আলখেল্লা পরে আরব বেদুইন সাজল ও।

গলায় ঝোলাল সুতির মোটা চাদর, কিনারায় সারি সারি গোলাপ বোনা। এই চাদর দেখেই চিনে নেবে ওকে সিক্সটিনাইন।

এলাকার একটা ম্যাপে চোখ বুলাল রানা, এক পাশে তুফা শহরের নকশাও আঁকা আছে। আশপাশের প্রায় সবগুলো গ্রামই মুসলমানদের, তবু বাধ্য না হলে ওদের কারও সাহায্য নেওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। এমনিতেই বিপদে আছে ওরা, দখলদার ইজরায়েলিদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আছে, তাদের বিপদ আরও বাড়াবার কোন মানে হয় না।

প্যারাশুটের মত ব্যাকপ্যাকটারও কবর হয়ে গেল, ওটার ভিতর ম্যাপটাও আছে। পুরানো, তোবড়ানো ব্রিফকেস নিয়ে ঢাল বেয়ে নামছে রানা। প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র কিছু ব্রিফকেসের ফলস্ বটমে আছে, কিছু আছে পকেটে।

লোডেড ওয়ালথারটা রানা সহজে নাগাল পাওয়ার জন্য কোমরে গুঁজে রেখেছে। তবে তুফা শহরে ঢুকবার সময় আবার ব্রিফকেসের ফলস্ বটমে লুকিয়ে রাখতে হবে ওটাকে, কারণ যে-কোনও শহরের প্রবেশ মুখে রাস্তা বন্ধ করে লোকজনের শরীরে তল্লাশি চালায় ইজরায়েলি সৈন্যরা। তবে বেদুইনদের সঙ্গে ছুরি পেলে সাধারণত কিছু বলে না তারা।

গ্রামগুলোকে এড়িয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এল রানা। তুফা এখান থেকে সাত-আট মাইল পশ্চিমে, পা চালিয়ে হাঁটলে ভোর হওয়ার আগেই পৌঁছানো যাবে। কিন্তু পশ্চিমে নয়, দক্ষিণ দিকে হাঁটছে ও এখন।

ছদ্মবেশটা নিখুঁত করতে হলে একটা মরু জাহাজ কিনতে হবে রানাকে। জুম্মার দিন কেল্লার ভিতর বেদুইনদের বাজারটা সকাল থেকেই জমে ওঠে, তবে তুফায় একটু বেলা করেই পৌঁছাতে চায় ও। সিক্সটিনাইন ওকে খুঁজে নিতে আসবে বেলা এগারেটা থেকে দুটোর মধ্যে। একটু বেলা করে তুফায় পৌঁছাতে চাওয়ার আরও একটা কারণ হলো, খোলা মরুভূমির কোথাও সেঁটে একটা ঘুম

দিতে চায় ও!

*

ভোর হওয়ার কিছুক্ষণ আগেই হেলিকপ্টার গানশিপ আর ট্যাংক নিয়ে রানার খোঁজে তুফায় পৌঁছে গেল ইজরায়েলি সৈন্যরা।

বেশ সমৃদ্ধ আর ব্যস্ত একটা মরুশহর তুফা। শহরের প্রধান আকর্ষণ পাথরের তৈরি প্রাচীন একটা কেল্লা।

দূর অতীতের কথা জানা যায় না, তবে পাঁচ সাতশো বছরের পুরানো শহরটা এই কেল্লার চারপাশেই গড়ে উঠেছে।

বিশাল কয়েকটা উঠান সহ কেল্লাটাও পুরানো শহরের একটা অংশ। ভিতরে কয়েকশো পরিবার বাস করে।

মূল উঠানে বাজার বসে। আরেক উঠানে আছে মসজিদ আর গির্জা, প্রায় পাশাপাশি। আরও আছে কবরস্থান, বড় আকারের কুয়া, পাথরের তৈরি প্রাচীন সুড়ঙ্গ, হস্তশিল্পের কারখানা আর বেশ্যাপাড়া।

পুরানো শহরের বেশিরভাগ মানুষই মুসলমান, খ্রিস্টানদের সংখ্যা নগণ্য। মুসলমানরা সবাই ফিলিস্তিনি নয়, মিশরের সিনাই মরুভূমি আর সিরিয়ার গোলান মালভূমি থেকে আসা বেশ কিছু উদ্বাস্তুও আছে। পুরানো শহরের লোকসংখ্যা পনেরো হাজারের কাছাকাছি। এখানে কোন ইহুদি নেই।

কেল্লার বাইরে, পুবদিকে, নিজেদের জন্য নতুন এবং আধুনিক একটা শহর গড়ে তুলেছে ইজরায়েলিরা। নতুন শহরের উত্তরে রয়েছে মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরিটা।

ভোর রাতে এই নতুন শহর আর মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরির মাঝখানে এসে নামল দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ। আর রাস্তা ধরে এল একটা ট্রুপস ক্যারিয়ার।

ক্যারিয়ারে নারী-পুরুষ মিলিয়ে সৈন্য রয়েছে বাহান্নজন, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর ফালাক আবরা। তার উপর নির্দেশ আছে, মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরির চারধারে মোতায়েন করা কয়েকটা

ট্যাংক আর কিছু সৈন্য নিয়ে প্রথমে তুফা শহর ঘিরে ফেলতে হবে, তারপর বিদেশী একজন গুপ্তচরের খোঁজে চালাতে হবে তল্লাশি অভিযান–প্রয়োজন হলে ঘরে ঘরে।

মেজর ফালাক আবরা-র সঙ্গে একই কপ্টারে চড়ে মোসাদ এজেন্ট এবরান বারাইদিও পৌঁছেছে তুফায়।

বারাইদি ছিল তেল আবিবে। জর্দানের বোরাক এয়ার লাইন্সে রোপণ করা ইনফরমার কাল রাতে রেডিও-টেলিফোনে ভয়ানক একটা খবর দিয়েছে তাকে। তাজা বোমার সঙ্গে তুলনা করা যায় সেটাকে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানা নেগেভ মরুভূমিতে, তুফা শহরের কাছাকাছি কোথাও, জাম্প করবে প্লেন থেকে।

তারপর রাত সাড়ে বারোটায় নেগেভ থেকে একটা অ্যান্টি-এয়ার ক্রাফট ইউনিট মোসাদ হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করল: অজ্ঞাত পরিচয় একটা ছোট প্লেনকে সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ মাইল ভিতরে মিসাইল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্লেনের ফুয়েল ট্যাংক আকাশেই বিস্ফোরিত হয়, তার আলোয় পাইলট কিংবা একজন আরোহীকে প্যারাশুট নিয়ে নামতে দেখা গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করে মোসাদের তরফ থেকে সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করা হলো, কাল বিলম্ব না করে গোটা এলাকায় চিরুনি অভিযান চালানো দরকার। আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে রাতেই রওনা হয়ে যায় হেলিকপ্টার গানশিপ দুটো, তার একটায় সাদা পোশাকে চড়ে বসে মোসাদ এজেন্ট এবরান বারাইদি।

রানা ড্রপ জোন ত্যাগ করবার এক ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েলি সৈন্যদের একটা ইউনিট পাহাড়ের ঢালটায় পৌঁছে যায়। রানাকে তারা না পেলেও, মাটিতে পুঁতে রাখা প্যারাশুট আর ব্যাকপ্যাক খুঁজে বের করতে খুব বেশি সময় নেয়নি ওদের কুকুর।

ঢাল থেকে নেমে পশ্চিম, অর্থাৎ তুফার দিকে রওনা হয়

সৈন্যরা, কারণ কাছাকাছি ওই একটাই শহর। কিন্তু রানা গেছে দক্ষিণে, খোলা মরুভূমির দিকে; ফলে তারা ওকে খুঁজে পায়নি।

এখনও।

সাড়ে তিন মাইল হেঁটে একটা ছোট পাহাড়ের নীচে, সরু গুহার ভিতর ঘুমিয়েছে রানা। রাতেই টের পেয়েছিল কাছাকাছি কোথাও বেদুইনরা আছে–রবাবের তারে দু'একটা টোকা পড়ছিল, মাঝে মাঝে বিচ্ছিরি খেঁক-খেঁক শব্দে ডেকে উঠছিল উটের দল।

সকালে তাদেরই চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। গুহা থেকে বেরিয়ে দেখল, পাহাড়ি ঝরণার পাশে ভোরবেলাই পশুর হাট বসে গেছে।

হাট যখন, রানার জন্য সুবিধেই হলো। নোংরা কাপড়চোপড় পরা প্রচুর বেদুইন ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সঙ্গে ওর যদি কোন অমিল থাকেও, সহজে চোখে পড়বার মত নয়।

ঝরণার পানিতে মুখ-হাত ধুয়ে তাওয়ায় সেঁকা আটার রুটি খেল ও, ছাগলের দুধ দিয়ে তৈরি পনির আর অসম্ভব মিষ্টি চা সহযোগে।

দেখে-শুনে একহারা গড়নের একটা উট কিনল রানা, তারপর সকাল আটটার মধ্যে কাফেলার সঙ্গে রওনা হয়ে গেল তুফার উদ্দেশে।

এত তাড়াতাড়ি শহরে ঢুকবার ইচ্ছে ওর ছিল না, তবে একটা কাফেলার সঙ্গে থাকবার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে তিন মাইল হাঁটলেই তুফা। এক মাইলও পার হয়নি কাফেলা, হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে মাথার উপর দু'তিনবার চক্কর দিল একটা হেলিকপ্টার গানশিপ, তারপর শহরের দিকে চলে গেল।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। ভাবছে, ইজরায়েলি এয়ার

ফোর্স-এর এই তৎপরতার সঙ্গে ওর অনুপ্রবেশের কি কোন সম্পর্ক আছে?

একটু পরই জানা গেল—আছে।

প্রথম হেলিকপ্টার গানশিপ অদৃশ্য হয়েছে কি হয়নি, দ্বিতীয়টা চলে এল মাথার উপর। খোলা দরজার সামনে মেশিন গান বসিয়ে কাফেলার উপর কড়া নজর রাখছে সৈন্যরা।

কাফেলার সঙ্গেই থাকতে হবে রানাকে, তুফাতেও ঢুকতে হবে, পালাবার কোন উপায় নেই।

ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে তুফা।

দূর থেকেই দেখা গেল শহরের প্রবেশ মুখে একজোড়া ট্যাংক দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাথুরে প্রাচীর ঘেঁষে টহল দিচ্ছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। কাফেলাকে আসতে দেখে দু'সারিতে দাঁড়িয়ে একটা প্যাসেজ তৈরি করল কিছু সৈন্য।

আরবী আর হিব্রু ভাষায় নির্দেশ দিল তারা। উট থেকে নেমে পায়ে হেঁটে শহরে ঢুকতে হবে বেদুইনদের। তার আগে প্রত্যেকের মাল-সামান আর দেহ সার্চ করা হবে, পরীক্ষা করে দেখা হবে শহরে ঢুকবার অনুমতি-পত্র নবায়ন করা হয়েছে কিনা।

পঞ্চাশটা উটের কাফেলা। কমবেশি সত্তরজন নানা বয়সের বেদুইন ব্যবসায়ী। রানা রয়েছে সতেরো জনের পিছনে। সকাল এগারোটার আগে শহরে ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না।

ওর পালা আসবার আগেই দু'জনকে ধরে কাছাকাছি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো ইন্টারোগেট করবার জন্য। একজনের অপরাধ, অন্য কোন লোকের অনুমতি-পত্রে নিজের ফটো লাগিয়েছে। আরেকজনের কাছে পাওয়া গেছে সাদা পাউডার, সম্ভবত নিষিদ্ধ হেরোইন।

এবার রানার পালা। তখনও ওকে সার্চ করা শুরু হয়নি, হঠাৎ হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে একটা মেশিন গান গর্জে উঠল। ওদের সবার চোখের সামনে খুন হয়ে গেল দু'জন বেদুইন তরুণ।

ওদের মাথার উপর সারাক্ষণই চক্কর দিচ্ছিল একটা হেলিকপ্টার। হয়তো ফাঁদের একটা অংশ হিসাবেই সেটাকে দু'তিন মিনিট কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এটাকে সুযোগ মনে করে দুজন বেদুইন তরুণ কাফেলা ছেড়ে কেটে পড়বার তাল করেছিল।

তাদের ধারণা ছিল সৈন্যদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েকটা বালিয়াড়ি পেরুতে পারলেই এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে।

কিন্তু প্রথম বালিয়াড়ি টপকে দ্বিতীয়টায় উঠেছে মাত্র, এই সময় শিকারি বাজপাখির মত ছুটে এল সেই লুকানো হেলিকপ্টার গানশিপ।

ওদের চোখের সামনে, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল ছেলে দুটো। বালিয়াড়ি থেকে গড়িয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল তারা, তারপরই পরপর দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল।

বালিয়াড়ির ওদিকটায় ধুলো-বালির মেঘ সৃষ্টি হলো, ভিতরে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল আগুনে লাল শিখা। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মেঘটা।

কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে তরুণ দু'জন বেদুইনদের ছদ্মবেশ নিয়ে তুফায় ঢুকবার জন্য এসেছিল। নিশ্চয়ই ফিলিস্তিনি মুক্তিযোদ্ধা–হামাস কিংবা হিযবুল্লাহর সদস্য। প্রচুর বিস্ফোরক ছিল ওদের সঙ্গে।

শহরের ঢুকবার ফটকে সারা বছরই সৈন্যদের পাহারা থাকে, তবে টহল পার্টি থাকে না। শহরটাকে ঘিরে রাখা প্রাচীন পাথুরে পাঁচিল অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে, তরুণ দু'জন সম্ভবত ওরকম কোন ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকবার প্ল্যান করেছিল।

মেশিন গানের গর্জন আর বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে বেদুইনদের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা দিল।

'খামোশ!' গর্জে উঠল সৈন্যরা। 'খবরদার কেউ যদি লাইন

ভাঙো!'

'এই, উজবুক,' সামনে দাঁড়ানো সৈন্য এক হাতে বাগিয়ে ধরা স্টেনগান দিয়ে খোঁচা মারল রানার পাঁজরে, 'এ দিকে তাকা।' তাকাল রানা। 'হাতের ব্রিফকেসে কী?'

'তোর নিয়তি,' আরবীতেই বলল রানা।

সৈন্যটা হকচকিয়ে গেলেও, তা মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য। 'কী! আমার সঙ্গে রসিকতা করছিস? চোখের সামনে দুটো লাশ পড়ে যেতে দেখেও তোর...'

'আমি সব সময় সত্যি কথা বলি।' রানা নির্লিপ্ত, চোখে-মুখে কিছুটা দার্শনিকসুলভ ভাব। 'মানুষের নিয়তি বদলে দেয়াই আমার সারা জীবনের সাধনা। কেউ যদি আমার সাহায্য চায়,' ইঙ্গিতে ব্রিফকেসটা দেখাল, 'তার জন্যে এর ভিতর ভাগ্য পরিবর্তনের উপকরণ আছে।'

'তারমানে বোমা...' পিছাতে শুরু করে একজন সৈন্য অস্ফুটে বলল।

সৈন্যরা ভুল বুঝে অপ্রত্যাশিত কিছু করে বসবার আগেই ব্রিফকেসটা খুলে তাদের চোখের সামনে মেলে ধরল রানা।

দেখে মনে হয় ব্রিফকেস, আসলে এটা একটা মোবাইল শো-কেস। ভিতরে প্রথমেই কাঁচের একটা আচ্ছাদন দেখা গেল। তার নীচে কালো মখমল দিয়ে মোড়া খুদে আকৃতির খোপ। প্রতিটি খোপে একটা করে রঙিন পাথর।

সবই যে দামী রত্ন, তা নয়—তবে আসল হীরে থেকে শুরু করে নীলা, আকিক, প্রবাল, বৈদুর্যমণি, ক্যাটস আই, মুনস্টোন, ইরানি ফিরোজা, সিংহলী টোপায, বার্মিজ চুনি, ব্রাজিলিয়ান পান্না ইত্যাদি নানান জাতের পাথরের অনেকগুলোই নির্ভেজাল।

সৈন্যদের পেশীতে ঢিল পড়ল। রানাকে শো-কেস বন্ধ করতে বলে শহরে ঢুকবার অনুমতি-পত্র দেখতে চাইল তারা।

বিস্ফোরক বহনকারী দুই তরুণ গুলি খেয়ে মরে যাওয়ার পর

ইজরায়েলি সৈন্যদের মধ্যে শিথিল একটা ভাব এসে গেছে, কারণ তাদের ধারণা হয়েছে, ওই দুই তরুণকে ধরবার জন্যই এখানে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। কাফেলার বাকি বেদুইনদের দেহ তল্লাশি করা এখন স্রেফ একটা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একজন সৈন্য রানার অনুমতি পত্রে চোখ বুলিয়ে ইঙ্গিতে ওকে সামনে এগোতে বলল। কোমরে জড়ানো উটের রশিটা হাত দিয়ে ধরে হেলেদুলে ফটক পার হলো রানা। রঙচঙে ডায়ালসহ ঢাউস একটা জাপানি রিস্টওয়াচে সাড়ে এগারোটা বাজে।

একবার চোখ বুলিয়েই টের পেয়ে গেল ও, শহরের পরিবেশ কী রকম বিপজ্জনক হয়ে আছে। রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় বালির বস্তার স্তূপ তৈরি করে পজিশন নিয়েছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। দু'তিনজনের একটা করে টিম টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, শহরের মানুষ কিন্তু আতঙ্কিত নয়। গম্ভীর এবং উত্তেজিত, কিন্তু সন্ত্রস্ত কিংবা ভীত বলে মনে হচ্ছে না; বরং চলন-বলন আর হাবভাবে বেপরোয়া একটা ভাবই চোখে পড়ছে।

এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা: অভ্যাস। কম দিন তো হলো না ওরা এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করছে।

আরেক ফটক দিয়ে কেল্লার ভিতর ঢুকবার সময় দু'পাশে আট-দশজন সৈন্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, তাদের মধ্যে একজন মেজর রয়েছে।

বোরকা পরা, তবে মুখের আবরণ খোলা, পাঁচ-সাতজন তরুণীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে সৈন্যরা। মেজর ফালাক আবরা বলছে, তাদেরও দেহ তল্লাশি করতে দিতে হবে, তা না হলে একজনকেও কেল্লার ভিতর ঢুকতে দেওয়া হবে না।

রানার চোখে মেয়েগুলোকে অসাধারণ সুন্দর লাগল। কিন্তু ইজরায়েলি মেজরের সঙ্গে তাদের সকৌতুক আচরণ বিস্মিত করল

ওকে।

ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ধরে রেখে, চোখের তারা কোণে সরিয়ে এনে উত্তরে তারা বলছে, দেহ তল্লাশি করতে হলে মেজর সাহেবকে তাদের বাড়িতে ঢুকতে হবে, কারণ শুধু চার-দেয়ালের ভিতরই একজন পুরুষ কোন মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিতে পারে।

এসব কথা বলবার সময় মেয়েগুলো উচ্ছল, তরল হাসিতে ভেঙে পড়ছে, ঢলে পড়ছে পরস্পরের গায়ে। রানাকে দেখে তাদের মধ্যে একটা সকৌতুক ফিসফিসানিও লক্ষ করা গেল।

সৈন্যরা ফটকের কাছে কাউকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। উট নিয়ে মূল উঠানে ঢুকে পড়ল রানা। সিক্সটিনাইন ওকে খুঁজে নেবে ঠিকই, তবে নির্দিষ্ট একটা এলাকা থেকে।

বেদুইনদের বাজারটা সকাল থেকেই জমে উঠেছে। ক্রেতাদেরও উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করল রানা। সৈন্যদের উপস্থিতি কেউই যেন গায়ে মাখতে চাইছে না।

বিশাল উঠানের এক কোণে উট বেঁধে রেখে বাজারে ঢুকল রানা। বেদুইন হকাররা দেয়ালবিহীন চালাঘরের নীচে শতরঞ্চি বা চাদর বিছিয়ে নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে রানা, সুবিধে মত ফাঁকা একটা জায়গা পেলে বসবে।

চেহারা-সুরত দেখেই বোঝা যায় ক্রেতারা সবাই ফিলিস্তিনি অর্থাৎ পুরানো শহরের লোকজন নয়। নতুন শহরের ইহুদিরা আজ জুম্মার দিন বলে নয়, প্রায় প্রতিদিনই এখানে কেনাকাটা করতে আসে। তারা শার্ট-ট্রাউজার বা কোট-টাই পরা লোকজন। ওদের মেয়েগুলোও স্কার্ট পরা।

নতুন শহরে বাজার নেই। নেই আরও একটা জিনিস—ছোটখাট কাজ করবার মানুষ: মিস্ত্রি, মালী, চাকর, মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরির জন্য আধা দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি।

সবাই যদি হাঁটে, তাদের মধ্যে হঠাৎ কেউ থমকে দাঁড়ালে,

তা এক সেকেন্ডের জন্য হলেও, চোখের কোণে ধরা পড়বে।

রানার ঠিক তাই হলো। উল্টোদিক থেকে আসা জনস্রোত ঠেলে এগোচ্ছে ও। লোকটা যথেষ্ট লম্বা বলেই তার হাঁটবার ছন্দে সামান্য পতন হলেও ব্যাপারটা ঠিকই ধরা পড়ল ওর দৃষ্টিতে। পরমুহূর্তে চোখাচোখি হলো।

এবরান বারাইদিকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল রানা।

তবে এক পলকেই নিজেকে সামলে নিয়েছে ধূর্ত মোসাদ এজেন্ট। নির্লিপ্ত, প্রায় বিষণ্ন চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই রানার ছদ্মবেশ সে ধরে ফেলেছে কি না।

যতই নিখুঁত হয়ে থাকুক রানার ছদ্মবেশ, ওকে সম্ভবত চিনে ফেলেছে বারাইদি; তা না হলে কী থমকাত?

বারাইদির ঠিক পিছনেই রয়েছে তিনজন সৈনিক; একটা টহল পার্টি।

চার

রানা গম্ভীর, চেহারায় রগচটা ভাব, দম্ভে যেন মাটিতে পা পড়ছে না–হুবহু একজন বেদুইন তরুণের স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি।

পাশ কাটানোর সময় দু'জনের দুই কাঁধ সামান্য ঘষা খেল।

আবার রানার দিকে তাকাল বারাইদি, দৃষ্টিতে অন্তর ভেদ করবার প্রয়াস।

তা হলে এখনও কি সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়?

রানার চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। কল্পনার চোখে ছবিটা

দেখতে পাচ্ছে ও: ছুরিটা বগলের নীচে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো–বিদ্যুদ্বেগে বের করে বারাইদির সোলার প্লেক্সাসে হাতলের কিনারা পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কল্পনাটা বাস্তবে পরিণত করবার প্রয়োজন হলো না; চোখে-মুখে সংশয় নিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল বারাইদি। পিছু পিছু টহল পার্টিও।

গলার চাদরটা দিয়ে মাথা ঢেকে দ্রুত নকল দাড়ি গোঁফ খুলে পকেটে রাখল রানা, তারপর হন হন করে এগোল।

বিশ-বাইশ গজ হেঁটে দুই হকারের মাঝখানে প্রায় গায়ের জোরে সামান্য একটু জায়গা করে নিল রানা, গলায় জড়ানো চাদরটা খুলে খানিকটা বিছাল, বাকিটা দিয়ে ঢেকে ফেলল ব্রিফকেস।

নাগালের মধ্যে শুধু ছুরিটা আছে, ওয়ালথারটা রয়েছে ব্রিফকেসের ফলস্ বটমে–প্রথম কাজ ওটাকে বের করা। বারাইদি নিজের চেহারায় সংশয় ফুটিয়ে তুললেও, তার মানে এই নয় যে রানাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারেনি সে। যে-কোন এসপিওনাজ এজেন্টকে ভাল অভিনেতা হতে হয়, বারাইদিকে রানা নির্দ্বিধায় প্রথম শ্রেণীর একজন এজেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

অর্থাৎ, মোসাদের চোখে ধরা পড়ে গেছে ও।

যে-কোন মুহূর্তে, যে-কোন দিক থেকে আক্রমণ আসবে। এত সৈন্য, ট্যাংক আর হেলিকপ্টার গানশিপ–শুধু ওকে ধরবার জন্য। টের পেল কীভাবে?

হকার দু'জন বেদুইন তরুণ, তাদের দাম্ভিকতা আর বদমেজাজ কৃত্রিম নয়; রানা ঠেলেঠুলে ওদের মাঝখানে জায়গা করে নিয়েছে দেখে ফণা তুলল তারা। একজন কনুই দিয়ে গুঁতো মারল ওর পাঁজরে, আরেকজন ব্রিফকেস ঢেকে রাখা চাদরের একটা প্রান্ত ধরে টান দিল।

বারাইদিকে দেখে কোণঠাসা বিড়ালের মত হিংস্র একটা ভাব

চলে এসেছে রানার মনে, রাস্তার উপর সতর্ক দৃষ্টি। ওর হাত দুটো চাদরের ভিতর নড়াচড়া করছে। এই সময় পাঁজরে লাগল গুঁতোটা, পরক্ষণে টান পড়ল চাদরে।

পালা করে দু'জনের দিকে তাকাল রানা। ওর দৃষ্টিতে কী ছিল ব্যাখ্যা করতে পারবে না ওরা, তবে চোখের পলকে পাথর হয়ে গেল বেদুইন তরুণরা–শিরদাঁড়ায় শিরশিরে অনুভূতি হলো, ছলকে উঠল বুকের রক্ত, একই সঙ্গে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই সেই টহল পার্টিকে ফিরে আসতে দেখা গেল। দাড়ি গোঁফ আছে, এমন লোকজনদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে, দেখছে তাদের কারও কাছে ব্রিফকেস আছে কি না। এক সময় রানার সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

মুখ তুলে তাকাল রানা। তিনজন সৈনিক হাতে বাগিয়ে ধরা স্টেনগান। আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বারাইদি পাঠিয়েছে। হয়তো নিশ্চিত হতে চাইছে সে, কিংবা বুঝতে চাইছে রানার সঙ্গে আরও কেউ আছে কি না।

একজন দেখছে রানাকে, বাকি দু'জন এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে। প্রথম লোকটা হঠাৎ ঝুঁকল, সাদা চাদর টান দিয়ে সরিয়ে নিল ব্রিসকেস থেকে।

ইতিমধ্যে, চাদরের আড়ালে থাকতেই ব্রিফকেসটা খুলে ফেলেছে রানা; ফলস বটমের আগ্নেয়াস্ত্র এখন আবার ওর কোমরের বেল্টে উঠে এসেছে।

ব্রিফকেসটাকে এখন আর ব্রিফকেস বলে চিনবার কোন উপায় নেই। এই মুহূর্তে ওটা একটা শো-কেস, কাঁচের ভিতর কালো মখমলের খোপে মূল্যবান সব মণি-মানিক্য আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

চাদরের প্রান্ত ছেড়ে দিল সৈনিক, থমথম করছে চোখ-মুখ। বাকি দু'জন বসে পড়ল রানার সামনে, যে যার হাতের তালু বাড়িয়ে ধরেছে।

শো-কেসের পাশে কালো রঙ করা ছোট একটা কার্ডবোর্ডের সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, তাতে সাদা রঙ দিয়ে আয়ু আর ভাগ্য রেখা সহ মানুষের একটা তালু আঁকা। সাইনবোর্ডের সামনে বিছানো হয়েছে রাশিচক্রের নকশা আঁকা একটা কাপড়।

অর্থাৎ রানা একজন জ্যোতিষী, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাস দেয়।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় সৈনিক রানাকে সন্দেহই করেনি, কারণ মোসাদ এজেন্ট বারাইদির দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে ওর চেহারা মেলেনি—দাড়ি-গোঁফ নেই।

তবে প্রথম সৈনিক, একজন ক্যাপটেন, দাড়ি-গোঁফ না থাকাটাকে গুরুত্ব দেয়নি। ইহুদিদের ক্ষতি করবার জন্য প্যারাশুট নিয়ে ইজরায়েলে নেমেছে, ওগুলো নকল হওয়ারই তো বেশি সম্ভাবনা। তা ছাড়া, তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে চাদরটা।

এই চাদরের কথা মেজর বারাইদি তাকে বলেছেন। কী ফুল বা ফুলগুলো সাদা কি না তা না বললেও, চাদরটার কিনারায় ফুল তো সে দেখতেই পাচ্ছে।

মেজর বলে দিয়েছেন, চেহারার বর্ণনা মিললে যা করবার অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে, কারণ এই লোক নাকি নিজের জানেরও পরোয়া করে না। কী করতে হবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন।

'এই, ওঠো তোমরা।' সঙ্গীদের নিতম্বে বুটের ডগা দিয়ে খোঁচা মারল ক্যাপটেন। তারা দাঁড়াচ্ছে দেখে সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'মেজর এবরান বারাইদি তোমার জন্যে আমাদের ক্যাম্পে অপেক্ষা করছেন,' রানাকে বলল। 'শো-কেস বন্ধ করে চলো আমাদের সঙ্গে।'

'মেজর এবরান বারাইদি?' হঠাৎ হাসল রানা। 'তিনি তুফায়? অনেকদিনের পরিচয়, বন্ধুই বলতে পারো। ঠিক আছে, তোমরা যাও, একটু পর আসছি আমি। এই তো সবে দোকান খুলে

বসেছি, বউনিটা অন্তত করি ।'

'না ।' স্টেনগানটা সরাসরি রানার বুকে তাক করল ক্যাপটেন । 'তোমাকে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, ওঠো ।'

স্টেনগানটা দেখেও না দেখবার ভান করল রানা । 'ঠিক আছে, তা হলে তাই চলো ।' রাজি হলো ও । শো-কেস বন্ধ করল । ক্যাপটেন লক্ষ করল, জিনিসটা আসলে ব্রিফকেস ।

সিধে হচ্ছে রানা, ব্রিফকেসটা বাকি দুই সৈনিকের দিকে বাড়িয়ে ধরল; অপর হাতটা আলখেল্লার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে । দুর্লভ রত্নে ভরা ব্রিফকেসটা ধরে ফেলল একজোড়া চঞ্চল হাত ।

ব্রিফকেস ঠিক যখন ছেড়ে দিচ্ছে, খালি হাতটায় চলে আসা ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল রানা । বাজার গমগম করছে, বহু লোকের সেই গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল ওয়ালথারের কর্কশ গর্জন ।

ক্যাপটেন যেন এইমাত্র তার কপালে বেশ বড় একটা লাল টিপ পরেছে ।

এক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে আরও দু'বার গর্জে উঠল ওয়ালথার । দুই সৈনিক ব্রিফকেস ছেড়ে দিয়ে যে যার বাম বুক চেপে ধরল ।

ব্রিফকেসটা এখন আবার রানার হাতে, আরেক মুঠোয় উদ্যত পিস্তল । লাফ দিয়ে ক্যাপটেনের লাশ টপকাল, বোকামির নিদর্শন চাদরটা পড়ে থাকল পিছনে । বাজারের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে ও ।

মূল্যবান পাথর সহ কালো মখমল খুদে একটা পোঁটলার আকৃতি পেল, চালান হয়ে গেল আলখেল্লার পকেটে । দৌড়ের মধ্যে আরও একটা কাজ সারল রানা । ফলস্ বটম থেকে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র বের করে নিয়ে ব্রিফকেসটা ফেলে দিল একপাশে ।

রানার সামনে ভোজবাজির মত দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ভ্রাম্যমাণ বেদুইন ফেরিঅলা আর ক্রেতাদের ভিড়। বিশেষ করে কেল্লার বাসিন্দারা, প্রায় সবাই ফিলিস্তিনি, স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা নিয়ে এরই মধ্যে লম্বা একটা প্যাসেজ তৈরি করে ফেলেছে–যেন গাইড করছে রানাকে।

নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে তারা: বিদেশী বন্ধু! যেভাবে পারো সাহায্য করো!

ভিড় হটিয়ে তৈরি করা প্যাসেজ ধরে ছুটছে রানা। ছোট একটা তোরণ পেরিয়ে কেল্লার দ্বিতীয় উঠানে বেরিয়ে এল।

অনেকটা দূরে একটা চার্চের চূড়া দেখা যাচ্ছে। নাক বরাবর সামনে, কেল্লার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দোতলা মসজিদ।

মসজিদের এক কোণে বিরাট একটা স্তম্ভ। স্তম্ভের গায়ে জাফরি কাটা, ভিতরে সিঁড়ির ধাপ দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভটা আসলে মিনার, মাথায় চারদিকে তাক করা চারটে লাউডস্পিকার।

'এখনই আজান শুরু হবে,' কে যেন ফিসফিস করল কানের কাছে। 'নামাজীদের কাতারে দাঁড়িয়ে যান।'

এখনও ছুটছে রানা। ভিড় সরিয়ে তৈরি করা প্যাসেজ ওর পিছনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার মানুষের নিরেট পাঁচিলে পরিণত হচ্ছে।

সামনে মসজিদের পাকা চাতাল। একপাশে লম্বাটে চৌবাচ্চা, ওজু করবার জন্য পরিষ্কার পানি টলটল করছে।

ঠাসঠাস করে গুলি হলো রানার পিছনে। শুরু হলো ছুটোছুটি আর চিৎকার-চেঁচামেচি। রানার পিছনে জোড়া লাগা প্যাসেজ নতুন করে খুলে যাচ্ছে। ফাঁকা আওয়াজ করে পথ করে নিচ্ছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। রানার নাগাল পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে তারা।

রানার এখন আর মসজিদে ঢোকা চলে না। ইজরায়েলি সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে কোণঠাসা অবস্থায় পাবে ওকে।

এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। মুসল্লীরা ওকে দেখছেন। আশপাশ থেকে দু'একজন বিড়বিড় করল: 'এসে পড়ল...পালাও বাপ্!'

কিন্তু কোথায় পালাবে রানা?

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত লাগছে নিজেকে।

অবশেষে মসজিদকে পাশ কাটিয়ে এক ছুটে মিনারের আড়ালে চলে এল রানা।

স্তম্ভ বা মিনারে ঢুকবার দরজাটা খোলাই পেল। সিঁড়িটা এক পাশে, আরেক পাশে একটা কাঠের আলমারি।

আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়স্ক মোয়াজ্জিন গায়ে একটা আচকান চাপাচ্ছেন।

পায়ের আর নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফেরালেন তিনি।

'আমি বিদেশী, আপনাদের বন্ধু,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'ইজরায়েলি সৈন্যরা আমাকে ধরতে আসছে।'

কান পেতেই ছিলেন মোয়াজ্জিন, মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আসছে।' আচকানটা তিনি গুঁজে দিলেন রানার হাতে। তারপর লাল আর সাদা রঙের সুতি চাদরটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রানার পিঠে আর ঘাড়ে জড়ালেন, মাথা থেকে খুলে পরিয়ে দিলেন টুপিটাও। ইঙ্গিতে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলেন। 'আল্লাহ আপনাকে নিশ্চয়ই বাঁচবার পথ দেখাবেন।' হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলালেন। 'আর মাত্র এক মিনিট...'

বাকিটা শুনবার জন্য ওখানে রানা দাঁড়িয়ে নেই। প্রতিবার দুটো করে ধাপ টপকে উপরে উঠছে ও।

ত্রিশ ফুট উঁচু মিনারের মাথাটা রেইলিং দিয়ে ঘেরা। কেল্লার এটা দক্ষিণ প্রান্ত, চওড়া সীমানা প্রাচীর আট-দশ ফুট নীচে। মসজিদের পাশে তিনতলা মাদ্রাসা, খোলা বারান্দায় ধর্মীয় কিতাব খুলে বসেছে একদল শিশু কিশোর।

মাউথপিসে দু'বার টোকা দিয়ে দেখে নিল রানা সিস্টেমটা

ঠিক আছে কিনা। তারপর শুরু করল:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ,
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।
হাইয়্যা আলাস্ সালাহ,
হাইয়্যা আলাস্ সালাহ।
হাইয়্যা আলাল ফালাহ,
হাইয়্যা আলাল ফালাহ।
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

আজান দেওয়া তখনও শেষ হয়নি, মসজিদের সামনের চাতাল থেকে ভেসে আসা উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কের আওয়াজ শুনতে পেল রানা—নামাজ পড়তে আসা মুসল্লীরা ইহুদি সৈন্যদের মসজিদের ভিতর ঢুকতে নিষেধ করছেন।

আজান দেওয়া শেষ হওয়া মাত্র গর্জে উঠল কয়েকটা স্টেনগান। রানা আশা করল, ফাঁকা আওয়াজ—আহত কারও কাতরানি শোনা গেল না। তবে তারপরই মুসল্লীরা একযোগে প্রতিবাদে ফেটে পড়ল।

তাতে অবশ্য কোন কাজ হলো না। থেমে থেমে গুলির আওয়াজ হচ্ছেই। সৈন্যদের বুট পরা পায়ের আওয়াজ শুনে রানা বুঝতে পারল মসজিদের ভিতর ঢুকে পড়েছে তারা।

মসজিদে ওকে না পেলে জানা কথা মিনারে উঠে আসবে সৈন্যরা। মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে শুধু এই মিনারেই ওঠা যায়। পাঁচিল টপকে পাশের মাদ্রাসা বা অন্য কোন দালানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ চারপাশের একটা পাঁচিলও বিশ ফুটের কম উঁচু

নয়।

কী করবে ভাবছে রানা, কিন্তু যথেষ্ট সময় পাওয়া গেল না। পেঁচানো সিঁড়ির গোড়ায় একটা হইচই বেধেছে। মনে হলো মোয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর, বলছেন—প্রাণ থাকতে তিনি কোন ইহুদিকে মিনারে উঠতে দেবেন না, তাতে মিনারের পবিত্রতা নষ্ট হবে।

তারপর একটা গুলি। এবং আর্তনাদ। কাতর কণ্ঠে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করছেন মোয়াজ্জিন।

পেঁচানো লোহার সিঁড়িতে কয়েক জোড়া বুটের আওয়াজ।

সৈন্যরা উঠে আসছে।

রানা জানে না কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে। দেখামাত্র গুলি করবে ওকে? নাকি জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবে ইন্টারোগেট করবার জন্য?

লাফ দিয়ে আট কি দশ ফুট নীচের চওড়া দুর্গ-প্রাকারে নামতে যাচ্ছে রানা। তারপর প্রাচীরের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লে বিশ ফুট নীচের নরম জমিনে নামা খুব একটা ঝুঁকির ব্যাপার হবে না হয়তো।

রেইলিং টপকাচ্ছে, এই সময় মাদ্রাসার ফাঁকা বারান্দায় চোখ পড়ল।

আজান শুরু হতেই যে যার কিতাব বন্ধ করে নামাজ পড়তে চলে গেছে শিশু কিশোর-ছাত্ররা।

তবে একজন ফিরে এসেছে। সাত কি আট বছরের একটা ছেলে রানার কাছ থেকে মাত্র সাড়ে তিন হাত দূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের স্লেটটা দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরা।

স্লেটে লেখাঃ 69।

পাঁচ

এক রেইলিং থেকে লাফ দিয়ে আরেক রেইলিঙে। পিলার ধরে ভারসাম্য রক্ষা। সবই যেন স্লো মোশনে ঘটছে। বারান্দার মেঝেতে পা দিয়ে নিজের কব্জি ছেলেটাকে ধরতে দেওয়া। তার সঙ্গে দৌড়। খোলা দরজা দিয়ে একটা ঘরের ভিতর ঢুকল ওরা।

পরমুহূর্তে মিনারের চূড়ায় বেরিয়ে এসে রানাকে দেখতে না পেয়ে হিংস্র আক্রোশে ফেটে পড়ল সৈন্যরা।

'ডাইভারশন ক্রিয়েট করে বিদেশী স্পাইকে অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'জাহান্নাম ছাড়া সরাবার জায়গা কোথায় ওদের? গোটা কেল্লা আমরা ঘিরে ফেলেছি।'

'মেজর আবরা বলেছেন, একটা পিঁপড়েও যাতে বেরুতে না পারে...'

রানাকে নিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চলে এল ছেলেটা। তারপর একটা করিডর পেরুল। শেষ মাথায় সিঁড়ি।

আবার করিডর, আবার সিঁড়ি। অবশেষে সরু প্যাসেজ। ঝড় তুলে ছুটছে ওরা। কারও সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। তবে গুলির শব্দ হচ্ছে, আর গুলি হলেই নিজের অজান্তে শিউরে উঠছে ছেলেটা। মুহূর্তের জন্য থমকাচ্ছে, তারপর আবার ছুটছে।

পাকা একটা চত্বরে বেরিয়ে এল ওরা। চত্বরের মাঝখানে,

মাথায় কংক্রিটের ছাদসহ, বিরাট কুয়া।

কুয়ার পাশে কালো বোরকা পরা এক তরুণী। মুখটা খোলা। ভরাট স্বাস্থ্য, টানা টানা চোখ। আগেও তাকে দেখেছে রানা। দেখেছে শহরে ঢুকবার সময়, প্রধান ফটকে–একজন মেজরের সঙ্গে রসিকতা করছিল। একা নয়, তার সঙ্গে আরও পাঁচ-ছয়টা মেয়ে ছিল।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল তরুণী। যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ ধরে প্রায় চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল বাচ্চাটা।

'সিক্সটিনাইন?' রানার প্রথম প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল তরুণী। 'তুমি নাইনটিসিক্স।' এখনও ছেলেটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, দৃষ্টিতে বিষণ্ণতা। 'ওর নাম নাবিল। জানে না ফিরে যাচ্ছে আব্বার লাশের কাছে।'

'ওর আব্বা...মুয়াজ্জিন?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী করে জানলে তিনি মারা গেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বোরকার ভিতরের পকেট থেকে একটা ওয়ায়্যারলেস সেট বের করে দেখাল মেয়েটি, তারপর বোতাম টিপে কাউকে একটা মেসেজ দিল আরবী ভাষায়ঃ সুরাইয়া বলছি। আমরা নামব, টানেলের মুখ খুলে দাও।'

রানা কিছু বলতে যাবে, বাধা দিয়ে ইঙ্গিতে কুয়াটা দেখাল সুরাইয়া, 'তুমি আগে থাকো, আমি তোমার পিছু নিই।'

উঁকি দিয়ে কুয়ার নীচে তাকাল রানা। দু'ফুট নীচে লোহার একটা রড, প্রান্ত দুটো কুয়ার ভিতরের দেয়ালে গাঁথা। রডের সঙ্গে একটা কপিকল দেখা যাচ্ছে, ওটার সাহায্যে বড় আকারের বালতি করে পানি তোলা হয়। তবে কুয়ার তলার দিকটায় গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কপিকলের পাশে রশির তৈরি একটা মইও রয়েছে। নষ্ট

করবার মত সময় নেই, মই বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

নাইলন রশি দিয়ে তৈরি মইটা যথেষ্ট মজবুত, দু'জনের ভারে ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় নেই। প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট নামবার পর আরও অনেকটা নীচে পারদের মত চকচকে একটা ভাব দেখতে পেল রানা।

একটু পর ওর মাথার উপর থেকে মেয়েটি বলল, 'থামো।'

সরু মই, তাই পাশ কাটাবার সময় রানার সঙ্গে ঘষা লাগল মেয়েটির কোমর। 'টানেলের মুখে অচেনা মানুষ দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে ওরা,' বলল সে।

আর মাত্র দশ ফুট নামতে হলো। কুয়ার দেয়ালে চওড়া একটা গর্ত দেখা গেল, তিন ফুট উঁচু, দশ ফুট লম্বা। টানেল নয়, বড়জোর গুহা বলা যেতে পারে। আসলে যান্ত্রিক কোন কৌশলে কুয়ার দেয়াল পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুহার শেষ মাথায় মাটি, অর্থাৎ ওদিক দিয়ে বেরুনো যাবে না।

একজোড়া কর্ড ধরে টান দিতে রশির মইটা উপরের রড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পড়ল। সেটা গুছিয়ে নিয়ে গুহায় ঢুকল মেয়েটি। রানা তাকে ডান দিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল।

মেয়েটির পিছু নিয়ে ফুট পাঁচেক এগিয়ে ডান দিকে আরও একটা গুহা দেখল রানা—না, এটাকে টানেল বলতে হবে। মেঝেটা পাকা, ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। বাল্ব জ্বলছে সিলিঙে, সেটা এতটাই উঁচু যে সিধে হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে।

আলখেল্লা পরা একজন ফিলিস্তিনি তরুণ সালাম দিল ওদেরকে। তার হাতে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র দেখল রানা।

বোতামে চাপ দিল তরুণ, সঙ্গে সঙ্গে গুহার পিছনের দেয়াল সচল হওয়ার আওয়াজ ভেসে এল। ওটা আসলে কুয়ারই নিরেট একটা অংশ, এখন আবার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে, ফলে ওদের চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল টানেলে ঢুকবার পথটাও।

ওদেরকে পথ দেখাল সিক্সটিনাইন। রানার পিছনে ফিলিস্তিনি

তরুণ। সামনে একটা সিঁড়ি পড়ল। ধাপ বেয়ে উঠবার সময় মেয়েটি বলল, 'তোমাকে আমি কেল্লায় ঢুকবার সময় দেখেছি—আমার সঙ্গে কয়েকটা মেয়ে ছিল।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। তারপর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইল, 'কারা ওরা?'

'পাড়ার মেয়ে,' জবাব দিল সিক্সটিনাইন। 'বোঝো তো পাড়ার মেয়ে কাদের বলে?'

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল।

'আমার নাম সুরাইয়া,' বলল সিক্সটিনাইন। 'নাম না জানলে কথা বলতে অস্বস্তি লাগে।'

'আমি রানা।'

'ভাবলাম, তুমি যখন কেল্লায় ঢুকবে তখন হয়তো ডাইভারশন ক্রিয়েট করার দরকার হবে, তাই মেয়েগুলোকে কেল্লার বাইরে আসতে বলে দিই আমি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তোমাদের মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একদল শিকারি কুকুর পিছনে লেগেছে...'

'ভুল হলো না?' সুরাইয়ার কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ কৌতুকের সুর।

'যেমন?'

'তোমার আগে তুফায় পৌঁছেছে ওরা, কাজেই তুমি বলতে পারো না যে...'

'পারি,' বাধা দিল রানা। 'কেন না আগে পৌঁছেও আমার চেয়ে পিছিয়ে আছে ওরা। যতক্ষণ না ধরতে পারে ততক্ষণ পিছিয়ে থাকবে।'

'ধরতে যাতে না পারে, সেজন্যেই তো আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যামিউনিশন ডিপোর ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

'আমাদের মানে? হামাস, না হিযবুল্লাহ?' জানতে চাইল

রানা।

'হামাস।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ।'

'পাড়ায়, ওই মেয়েগুলোর কাছে।'

রানা একটু বিব্রত। 'কেন?'

'কারণ,' ব্যাখ্যা করল সুরাইয়া, 'ইজরায়েলি সৈন্যদের বারণ করা আছে, মুসলমানদের বেশ্যাপাড়ায় ঢোকে না তারা। আপাতত এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় কোথাও তুমি পাবে না।'

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ধাপ টপকে একটা দরজার চৌকাঠ পেরুল ওরা। ছোট একটা কামরা, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত কয়েক সারি কাঠের বাক্স সাজানো।

প্রতিটি বাক্স ইস্পাতের সরু পাত দিয়ে জড়ানো, গায়ে লেখা–জেলিগনাইট।

পাশের কামরায় কয়েক ডজন একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল, গ্রেনেড ভর্তি বিশ-বাইশটা বাক্স, দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কয়েকটা বাজুকা দেখা গেল।

'এক মিনিট...কখন আবার ভুলে যাই,' বলতে বলতে আলখেল্লার ভিতর থেকে কালো মখমলের ছোট্ট পোঁটলাটা বের করল রানা। 'এই দায়িত্বটা তুমি নেবে? এটা পৌঁছে দিতে পারবে নাবিলের গুরুজনদের কাছে?'

'কেন, কী আছে ওটায়?'

'কয়েকটা পাথর। বেচলে, এই ধরো মার্কিন ডলারে হাজার পঞ্চাশেক পাওয়া যাবে।'

একটু যেন কঠিন হলো সুরাইয়ার চোখ দুটো। 'এটা যদি ক্ষতিপূরণ হয়, তার কিন্তু সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই। আমরা, ফিলিস্তিনিরা, কোন রকম প্রতিদান আশা না করে রোজই দু'চারজন স্বেচ্ছায় মারা যাচ্ছি।'

'জানি,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্রাণের ক্ষতিপূরণ আদৌ কি

কারও পক্ষে দেয়া সম্ভব? বলতে পারো, এ আমার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।'

'মানে?'

'নাবিলের আব্বা আমাকে মুয়াজ্জিনের পোশাক দিয়েছিলেন, মিনারের নীচে সৈন্যদের দেরি করিয়ে দিয়েছিলেন, সেজন্যেই এখনও বেঁচে আছি আমি।'

'ও।' রানার বাড়ানো হাত থেকে মখমলের ছোট্ট পোঁটলাটা নিল সুরাইয়া। আরও কিছু বলতে যাবে, তার আলখেল্লার ভিতর পিপ পিপ করে উঠল ওয়ায়্যারলেস সেট।

সেটটা বের করে আরবীতে কথা বলল সুরাইয়া।

রানা দেখল, মেয়েটির মুখ ধীরে ধীরে আতঙ্কের একটা মুখোশে পরিণত হচ্ছে। অপরপ্রান্ত থেকে কী মেসেজ আসছে বোঝা যাচ্ছে না, এদিক থেকে সুরাইয়া শুধু বেসুরো গলায় 'হুঁ-হাঁ' করে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি ভাল নয়, বুঝতে পেরে ফিলিস্তিনি তরুণটিও অস্থির আর উত্তেজিত হয়ে উঠল। আলখেল্লা ফাঁক করে ভিতর থেকে বেঢপ আকৃতির একটা মেশিন পিস্তল বের করছে সে, রানা দেখল তার শরীরে সরু আকৃতির অসংখ্য জেলিগনাইটের স্টিক এক করে বাঁধা রয়েছে, ডেটোনেটিং মেকানিজমসহ।

ওয়ায়্যারলেস সেট বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। একটা ঢোক গিলে বলল, 'আগে কখনও এরকম হয়নি।' স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, হাঁটাহাঁটি করছে।'

'কী?'

'ইজরায়েলি সৈন্যরা পাড়ায় ঢুকে পড়েছে। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে তারা...'

'তার মানে এখানে আমরা নিরাপদ নই?' প্রশ্ন করল রানা।

হঠাৎ স্থির হয়ে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। 'এই মুহূর্তে আমি তোমার বা আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি না, রানা।

আমি ভাবছি এই গোপন অ্যামিউনিশান ডিপো আর ঘাঁটির কথা। এটা হয়তো আমাদেরকে খোয়াতে হবে।'

'আপনি শহীদ হবেন, না ধরা দেবেন?' এই প্রথম কথা বলল ফিলিস্তিনি তরুণ, তাকিয়ে আছে সুরাইয়ার দিকে।

ঠোঁটে তিক্ত হাসির ক্ষীণ আভাস নিয়ে সুরাইয়া তাকে বলল, 'কে চায় নরকের স্বাদ পেতে? আমি সরাসরি স্বর্গে যাব।'

তরুণ ঘুরল, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে তার পিছু নিল সুরাইয়া।

'এক মিনিট,' পিছন থেকে বলল রানা। 'বিপদটা কী রকম, কোণ দিক থেকে আসছে, এ-সব জানা থাকলে আমি হয়তো কোন সাহায্য করতে বা পরামর্শ দিতে পারতাম।'

'সেটা পরে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল সুরাইয়া, চোখ দুটো দপ করে যেন জ্বলে উঠল। 'তার আগে এই ঘাঁটি উড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে...'

'ঘাঁটি ওড়ানো এক পলকের ব্যাপার...আগুনের একটা ফুলকি তৈরি করতে কতক্ষণ লাগে?'

'শুধু তো ঘাঁটি নয়, সঙ্গে যত বেশি পারা যায় দুশমনও মারতে হবে।' আবার ঘুরে পাশের কামরায় ঢুকে পড়ল সুরাইয়া।

তার পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল। এটাও ছোট একটা কামরা, বিস্ফোরকে ভর্তি। তবে এই বিস্ফোরক শুধু বিশেষ একটি কাজে ব্যবহার করা হয়।

প্রথমে মোটা সুতি কাপড় দিয়ে হাত কাটা একটা জ্যাকেট বানানো হয়েছে। জ্যাকেটের গায়ে অসংখ্য পকেট, সেগুলোয় ভরা হয়েছে সরু ও লম্বা জেলিগনাইটের টুকরো। একেকটা জ্যাকেটে কম করেও চার কেজি বিস্ফোরক ধরবে।

ডেটোনেটিং মেকানিজমের সরু তার প্রতিটি বিস্ফোরককে ছুঁয়ে উঠে এসেছে কলারের কাছে; ওটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই সবগুলো জেলিগনাইটের টুকরো একযোগে বিস্ফোরিত হবে।

জেলিগনাইট যাতে পকেট থেকে পড়ে না যায়, সেজন্য ইলাস্টিক লাগানো চওড়া ফিতে দিয়ে জ্যাকেটটাকে জড়ানোর ব্যবস্থাও করা আছে।

কামরাটার ভিতর শুধু এই জ্যাকেট আর একটা বাক্সে বেশ কিছু টাইমার আছে। আর কিছু নেই। হামাস সদস্য যারা আত্মঘাতী হতে চায়, এগুলো তাদের জন্য। কিছু জ্যাকেট দেয়ালে ঝুলছে, বাকি সব মেঝেতে স্তূপ করে রাখা।

ঝটপট বোরকা খুলে কামিজের উপর একটা জ্যাকেট পরছে সুরাইয়া। 'তাড়াতাড়ি করো, প্লিজ, রানা,' বলল সে।

'তুমি কি আমাকে আত্মহত্যা করার প্রস্তুতি নিতে বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা এখানে ফাঁদে পড়া ইঁদুর,' বলল সুরাইয়া। 'মরতে আমাদের হবেই। প্রশ্ন হলো, তুমি বন্দি হয়ে ওদের নির্যাতন ভোগ করে মরতে চাও, না কি ওদের কয়েকজনকে নিয়ে আত্মঘাতী হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ইজরায়েলে আমি আত্মঘাতী হতে আসিনি, সুরাইয়া। এসেছি বিশেষ একটা মিশন নিয়ে।

'তুমি বলছ, মরতে আমাদের হবেই, কারণ এখানে এটা ফাঁদ, আর সেই ফাঁদে আমরা আটকা পড়েছি। সত্যিই কি তাই? ব্যাখ্যা করো। ওয়ায়্যারলেসে কী মেসেজ পেলে তখন?'

জ্যাকেটের উপর আবার বোরকা পরবার সময় দ্রুত পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল সুরাইয়া।

কুয়ার ভিতর নেমে, গুহা আর টানেলে ঢুকে, এই কামরাগুলো পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায় একটা কাঠের ঘরে।

কাঠের ঘরটা আসলে একটা দেয়াল-আলমারি। ওটা থেকে বেশ্যাপাড়ার নেত্রী জয়তুন নেসার দুটো বেডরুমের একটায় বেরুনো যায়।

জয়তুনের বাড়ির ড্রইংরুমটাকে মেজর ফালাক আবরা তার

অফিস বা হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে। ওখানে বসে সৈনিকদের নির্দেশ দিচ্ছে সে, সেই নির্দেশ পেয়ে একটা সিস্টেম ধরে পাড়ার প্রতিটি বাড়ি আর কামরা তন্নতন্ন করে সার্চ করছে তারা–মূল উদ্দেশ্য, কেল্লার ভিতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চোরাই পথ খুঁজে বের করা।

'এই মেসেজ কে তোমাকে দিল? কোত্থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'জয়তুন নিজে,' বলল সুরাইয়া। 'তার একটা বেডরুম থেকে।'

'বেরুবার শুধু এই একটা পথ?' জানতে চাইল রানা। 'জয়তুনের একটা বেডরুমের দেয়াল-আলমারি?'

মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'হ্যাঁ।'

'আর তুমি ভয় পাচ্ছ, মেজর ফালাক আবরা এক সময় জয়তুনের বেডরুম দুটোও সার্চ করার নির্দেশ দেবে?'

'দেবে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল সুরাইয়া।

মাথা চুলকাল রানা। 'হ্যাঁ, দেয়ারই কথা।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। 'কিন্তু পালাবার পথ যে একেবারে বন্ধ, তা তো নয়। যে পথ দিয়ে এলাম...অর্থাৎ কুয়া দিয়ে আবার বেরিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'পারি না,' বলল সুরাইয়া। 'কারণ, কুয়াটা সম্পর্কে রিপোর্ট পাবার পর মেজর আবরা নির্দেশ দিয়েছে, বিস্ফোরকের সাহায্যে ওটাকে বুজিয়ে দিতে হবে।'

চকচকে ভাব হারিয়ে আবার ম্লান হয়ে গেল রানার চোখ দুটো। চিন্তার ভারে নত হয়ে থাকল মাথাটা। তবে তা মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্য।

মুখ তুলতে দেখা গেল রানার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে আছে। 'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল ও। 'এটাই একমাত্র উপায়।'

‘কী?’ সুরাইয়া মোটেও উৎসাহ পাচ্ছে না, বরং যেন একটু বিরক্তই।

‘তার আগে বলো, জয়তুনের সঙ্গে আবার কখন তোমার যোগাযোগ হবে?’

হাতঘড়ি দেখল সুরাইয়া। ‘বিশ মিনিট পর পর মেসেজ বিনিময় করার কথা। ওর সঙ্গে কথা বলতে হলে আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।’

‘সেক্ষেত্রে প্রার্থনা করো আগামী পনেরো মিনিট যেন ইজরায়েলিরা জয়তুনের বেডরুমে না ঢোকে।’

‘তোমার প্ল্যানটা কী, বলবে আমাকে?’ রাগ চেপে জানতে চাইল সুরাইয়া।

‘খুব সহজ,’ বলল রানা। ‘দেয়াল-আলমারিটা যে ঘরে আছে, সেই ঘরে বিছানায় শোয়াতে হবে মেজর আবরাকে। একা নয়, তার সঙ্গে একটা মেয়েও শোবে। মেয়ে দু’তিনটে হলেও ক্ষতি নেই–তাতে তাকে ব্যস্ত রাখা সহজ হবে।’

‘রাখল ব্যস্ত, তাতে লাভ?’ চেহারা একটু লালচে হয়ে উঠল সুরাইয়ার। প্ল্যানটা তার মাথায় ঢুকছে না।

‘কোথায় লাভ বুঝতে পারছ না? লাভ হলো–কোন লোক মেয়েদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সে তার বেডরুমে অন্য কোন পুরুষকে ঢোকার অনুমতি দেয় না।’

এক সেকেন্ড চিন্তা করল সুরাইয়া। ‘এটা যে একটা চালাকি, মেজর আবরা তা বুঝে ফেলবে। তা ছাড়া, এমনিতেও, ডিউটির সময় ফুর্তি করতে রাজি হবে না সে।’

‘কেল্লায় ঢোকার সময় আমি তার চোখে যে ভাবটা দেখেছি তাকে বলে...লোলুপ দৃষ্টি। এ হলো সেই জাতের পুরুষ, সুন্দরী মেয়ে দেখলে যার মাথা খারাপ হয়ে যায়।’

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। ‘আমি তাকে একদম সামনে থেকে দেখেছি, সেজন্যেই একমত হতে পারছি না। এ লোক নারীর

ছলনায় ভুলবে না।’

‘ঠিক আছে, মেয়েদের প্রতি তার দুর্বলতা কম,’ বলল রানা। ‘কিন্তু প্রফেশনাল মেয়েগুলো ওখানে আছে কী করতে? একটা লোককে বেডরুমে এনে শোয়াতে পারবে না?’

‘ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখতে পারে ওরা,’ বলল সুরাইয়া। ‘কিন্তু ভেবে দেখেছ, একটা পুরুষকে কতক্ষণ বিছানায় আটকে রাখা সম্ভব? তারপর কী হবে?’

‘তারপর অনেক কিছু হতে পারে,’ বলল রানা। ‘ধরো, আমরা আলমারির ভেতর দাঁড়িয়ে বেডরুমে চোখ রাখলাম। মেজরের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে যেতে পারি। পাশের ঘর থেকে পাশের বাড়িতে...’

‘সম্ভব নয়,’ তাড়াতাড়ি বলল সুরাইয়া। ‘জয়তুনের বাড়ির সামনে অন্তত আধ ডজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে।’

‘সম্ভব,’ বলল রানা, ‘কারণ আমরা বাড়িটার সামনে দিয়ে বেরুব না, বেরুব পাঁচিল টপকে বা খিড়কি দরজা দিয়ে–প্রতিবেশী কারও বাড়িতে; যে বাড়ি সৈনিকরা আগেই সার্চ করেছে।’

রানার দিকে এবার সুরাইয়া যেন নতুন দৃষ্টিতে তাকাল। ‘এটাই বোধহয় তোমার বৈশিষ্ট্য। কোনমতে হাল ছাড়তে জানো না।’

রানার কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়ায় মনে মনে হতাশ হতে হলো সুরাইয়াকে।

নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে ঝুলন্ত জ্যাকেটগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। পকেট থেকে জেলিগনাইটের কিছু স্টিক আর ডেটোনেটর এবং বাক্স থেকে কিছু টাইমার তুলে চালান করে দিল আলখেল্লার ভিতর।

তারপর হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে সুরাইয়াকে বলল, ‘কাজের কথা এখনও আমরা শুরুই করতে পারলাম না।

জয়তুনকে মেসেজ পাঠাবে তুমি আরও দশ মিনিট পর, এই ফাঁকে আমাকে বলবে, আইয়াম আর নাজাফিতে আসলে কী ঘটছে।'

'পিএলও-র ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের বিসিআই মাত্র তিন দিন আগে অ্যালার্ট করেছে আমাকে,' বলল সুরাইয়া। 'আইয়াম বা নাজাফি সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।'

'তোমরা এটুকু অন্তত জানো তো যে ইজরায়েল নতুন ধরনের একটা মারণাস্ত্র তৈরি করেছে? সেটা দিয়ে ইচ্ছে করলে এক পলকে ইস্পাত পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে?'

বোবাদৃষ্টিতে রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকবার পর কলের পুতুলের মত মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'না তো!'

'তা হলে কী জানো?'

'আইয়াম সম্পর্কে জানি, মার্কিনিরা ওখানে একটা এয়ার বেইস গড়ে তুলছে,' বলল সুরাইয়া। 'আর নাজাফি সম্পর্কে বলা হয়, ইজরায়েলিরা ওখানে একটা স্পেস সেন্টার তৈরি করেছে। মাঝে মধ্যে রকেট পরীক্ষা করে। লোকে ঠাট্টা করে বলে, আমাদের মার খেয়ে টিকতে না পারলে ইজরায়েলিরা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে বসতি গাড়বে।'

'তোমরা আরও ভাল করে খোঁজ নাওনি, বিশেষ করে নাজাফিতে কী করছে ওরা?'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'এরকম আরও অনেক জায়গায় অনেক কিছু করছে দখলদার ইজরায়েলিরা, সিকিউরিটি এত কড়া যে ধারেকাছে ঘেঁষা যায় না। তা ছাড়া, নতুন নতুন এলাকা দখল করে ঘর-বাড়ি তৈরি করছে ইহুদিরা, সে-সব কাজে বাধা দিতেই আমাদের সব সময় বেরিয়ে যায়...'

'মোসাদ এজেন্ট মেজর এবরান বারাইদির নাম শুনেছ? তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'হ্যাঁ, বলো—তার সম্পর্কে

জানি।'

'কী জানো?'

'অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে। এয়ার ফোর্সের পাইলট ছিল। অ্যাস্ট্রনট হবার ট্রেনিং নিতে নাসায় গিয়েছিল। বেশ ক'বছর হলো মোসাদে আছে।'

'আর কী জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখন সে কোথায়?'

'বর্তমানে নাজাফিতে আছে সে,' বলল সুরাইয়া। 'শোনা যায় দুটো পদে–রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ সিকিউরিটি অফিসার। প্রথম পদটা সম্ভবত কাছ থেকে বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের ওপর নজর রাখার জন্য দেয়া হয়েছে।'

'তুমি জানো সে এখানে, তুফায়?'

নিজের অজান্তেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সুরাইয়ার। 'না। সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর বলল, 'বারাইদিকে দরকার আমার, সুরাইয়া। এখান থেকে বেরুতে পারলে আমার প্রথম কাজ হবে ওকে ধরে ইন্টারোগেট করা।'

'কিন্তু আমার ধারণা ছিল খুব তাড়াতাড়ি নাজাফিতে পৌঁছাতে চাও তুমি,' বলল সুরাইয়া। 'এটা ধরে নিয়েই প্ল্যানটা তৈরি করে রেখেছি আমি...'

'কী প্ল্যান শুনি তো?'

'বেদুইনরা ঘোড়া নিয়ে গিরিখাদে অপেক্ষা করবে...'

এই সময় প্রবল একটা ঝাঁকি খেল কামরাটা। তাল সামলাতে না পেরে সুরাইয়া আর ফিলিস্তিনি তরুণ ছিটকে পড়ল, শুধু রানা দেয়াল ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের ভোঁতা একটা আওয়াজ।

সুরাইয়াকে সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। তরুণ ফিলিস্তিনি নিজের চেষ্টায় দাঁড়াল। তার দিকে ফিরে সুরাইয়া আরবীতে বলল, 'কুয়া দিয়ে আর বেরুনো যাবে না।'

‘আমি দেখে আসি কতটুকু কী ক্ষতি হয়েছে,’ বলেই ছুটল তরুণ।

‘আমরা দেয়াল-আলমারির কাছে থাকব,’ তার পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল সুরাইয়া।

ছয়

রানা দেয়াল-আলমারির পিছনে দাঁড়াবার পর বিশ মিনিট পার হতে চলেছে, অথচ প্রায় ওই একই সময় থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিন-তিনটে অপরূপ সুন্দরী বারাঙ্গনা মেজর আবরাকে বিছানায় কাত করতে পারছে না।

প্রকাণ্ডদেহী আবরা বিছানার কিনারায় বসে পা দোলাচ্ছে, বাম হাতের ওয়াকি-টকি চেপে ধরে রেখেছে কানে। সৈনিকদের পাঠানো রিপোর্ট মন দিয়ে শুনছে সে, মাঝে মধ্যে কর্কশ গলায় হিব্রু ভাষায় খেঁকিয়ে উঠছে।

ফিলিস্তিনি তরুণ কুয়াটার ক্ষয়-ক্ষতি দেখবার জন্য কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার পর রানাকে নিয়ে প্রায় দুশো গজ লম্বা একটা টানেলে বেরিয়ে আসে সুরাইয়া।

টানেলের মাঝামাঝি পৌঁছে ওয়য়্যারলেসে জয়তুনের সঙ্গে কথা হলো তার।

কী করতে হবে বুঝে নিয়ে সেট বন্ধ করে দিল জয়তুন।

টানেলের বাকিটুকু পেরিয়ে একপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরটার একদিকের দেয়াল ইস্পাতের পাত দিয়ে

তৈরি, লোহার ফ্রেমে আটকানো।

গোল একটা হুইল ঘুরিয়ে ইস্পাতের পাত অর্থাৎ কবাটসদৃশ অংশটা প্রায় নিঃশব্দে খোলা যায়। কবাটের অপর পিঠে রয়েছে ইঁটের গাঁথুনি আর সিমেন্টের প্লাস্টার, তার উপর পেরেক দিয়ে গাঁথা পালিশ করা তক্তা–একটা দেয়াল-আলমারির পিছনটা ঠিক যেমন হওয়ার কথা।

সুরাইয়া হাতল ঘুরিয়ে ইস্পাতের পাল্লা খুলবার পর দেয়াল-আলমারির ভিতরটা দেখতে পেল রানা।

আলমারির ভিতর তিনটে সেলফ বা তাক রয়েছে, নানা ধরনের সৌখিন জিনিস-পত্রে ঠাসা। ওটার কবাটের দুই তৃতীয়াংশে কাঁচ লাগানো। নীচের সেলফে কিছু নেই, ওটার সামনে কাঁচের বদলে কাঠের পাল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই পাল্লা খুলে আলমারির ভিতর দিয়ে বেডরুমটায় ঢোকা যায়।

ঘরের ভিতর আলো জ্বালেনি ওরা, ফলে জয়তুনের বেডরুম থেকে আলমারির তাকগুলোর পিছনটা কেউ দেখতে পাবে না। আর বেডরুমে আলো থাকায় ওখানে কি ঘটছে না ঘটছে তার সবই আলমারির পিছন থেকে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

বেডরুমে তাকিয়েছে রানা দু'মিনিটও হয়নি, চারটে মেয়ে মেজর আবরাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। তাদের মধ্যে একজনের বয়স একটু বেশি, পঁয়ত্রিশের কম হবে না। তাকেই জয়তুন বলে ধরে নিল রানা। চারজনের কেউ ভুলেও দেয়াল-আলমারির দিকে তাকাচ্ছে না।

আনন্দ-ফুর্তি করবে কী, পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসেই হাতের ওয়াকি-টকি অন করে সৈন্যদের নির্দেশ দিতে শুরু করল মেজর আবরা।

জয়তুনের ইঙ্গিতে বিছানায় তার দু'পাশে দুটো মেয়ে বসল। অপর মেয়েটা বসল তার পায়ের কাছে। সকৌতুক আচরণ তাদের; কখনও হেসে গড়িয়ে পড়ছে মেজরের গায়ে, কখনও

কামানো গালে হাত বুলিয়ে আদর করছে।

এ-সবই উত্তেজিত করবার চেষ্টা, তবে হালকা ভাবে। জয়তুন ইঙ্গিতে বেশি বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে দিল, তা না হলে মেজর আবরা সন্দেহ করে বসতে পারে। সেজন্যই মেঝেতে বসা মেয়েটা আবরার ট্রাউজার খুলবার কাজটা শুরু করেও শেষ করল না।

মিনিট দশেক পর ওদের চারজনকে রেখে বেডরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল হতাশ জয়তুন। পাঁচ মিনিট পর আবার ফিরে এল সে, হাতের ট্রেতে একটা কাঁচের জগ আর কয়েকটা গ্লাস। জগে পেস্তা বাদাম আর জাফরান দিয়ে তৈরি শরবত, উপরে বরফের টুকরো ভাসছে।

একটা মেয়ে মেজর আবরার ঠোঁটের কাছে শরবতের গ্লাস ধরল, আদুরে গলায় চুমুক দিতে বলছে। গ্লাসটা নিল আবরা, তারপর মেয়েটির আদুরে ভঙ্গি অনুকরণ করে তাকেই চুমুক দিতে বলছে।

'দেখলে, হারামজাদা কী রকম সাবধানী?' ফিসফিস করল রানা।

ওর পিছন থেকে উঁকি দিয়ে সুরাইয়াও বেডরুমের ভিতর তাকিয়ে আছে। সে-ও ফিসফিস করে জবাব দিল, 'হুঁ। শরবতে বিষ থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে।'

জয়তুনের ইঙ্গিতে অর্ধেক গ্লাস খালি করে ফেলল মেয়েটি। দ্বিতীয়বার সাধতে এতটুকু ইতস্তত না করে মেজর আবরাও বাকিটুকু ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল।

জয়তুনের ইশারা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটা আবার ভরে দিল মেয়েটি।

রানার বুঝতে বাকি থাকল না, আবরাকে জয়তুন শরবত খাওয়াচ্ছে এই আশায় যে তার যাতে পেচ্ছাবের বেগ হয়। তা হলে তাকে বাথরুমে যেতে হবে। জয়তুন ভাবছে, সেই সুযোগে

দেয়াল-আলমারি থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে রানা আর সুরাইয়া।

তারপর একেবারে বিনা নোটিশে হুড়মুড় করে কয়েকজন সৈনিক ঢুকল বেডরুমে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল তাদের নেতৃত্বে রয়েছে একজন তরুণ ক্যাপটেন।

দেখা গেল সৈনিকরা দু'দলে বিভক্ত। এক দল সার্চ পার্টি। আরেক দল এই বাড়ির গেটে পাহারা দিচ্ছিল।

সার্চ পার্টির উপর নির্দেশ আছে, এক এক করে গলির সবগুলো বাড়িতে তল্লাশি চালাতে হবে। সেভাবেই তারা এগোচ্ছিল।

কিন্তু এই বাড়ির সামনে এসে বাধা পেল তারা। প্রহরী সৈনিকরা মেজরের দোহাই দিয়ে তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু ক্যাপটেনের যুক্তি হলো, মেজর আবরাই তো তাকে প্রতিটি বাড়ি সার্চ করবার নির্দেশ দিয়েছে, কাজেই কারও প্রতিবাদে কান না দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সে, সরাসরি মেজরের মুখ থেকে শুনতে চায় সার্চ করতে হবে কি হবে না।

কথা শেষ করে মেজর আবরার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল সে।

মেজর আবরা চট করে একবার আড়চোখে দেয়াল-আলমারির দিকে তাকাল।

ক্যাপটেন আর মেজরের আচরণ দেখে দম আটকাল সুরাইয়া। রানার কাঁধে টোকা দিয়ে পিছিয়ে আসবার ইঙ্গিত দিল সে, নিজে এক লাফে চলে এল হুইলটার কাছে।

হুইল ঘুরিয়ে আলমারির পিছনের দেয়াল জায়গা মত সরিয়ে আনল সুরাইয়া। বেডরুম থেকে আলমারির কবাট এখন কেউ খুললে তার চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়বে না। তবে সে যদি কোনভাবে জেনে থাকে যে এখানে একটা চোরা পথ আছে, তা হলে আলাদা কথা।

সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালল সুরাইয়া। দেখল রানার হাতে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে। ফিলিস্তিনি তরুণের হাতেও একটা মেশিন পিস্তল দেখা যাচ্ছে; কুয়ার ওদিক থেকে কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে সে।

তিনজনই ওরা ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি দেয়ালটা থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে এসেছে, যেন ভয় পাচ্ছে বেডরুম থেকে বিস্ফোরকের সাহায্যে ওটা উড়িয়ে দিতে পারে ইজরায়েলি সৈন্যরা।

'যেভাবেই হোক সার্চ পার্টির ক্যাপটেন এই ঘাঁটির কথা জেনে ফেলেছে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, এখন মেজর আবরাও জানে।' একটা ঢোক গিলল সুরাইয়া। 'এখন উপায়?'

'আমি খুন হবার জন্য প্রস্তুত,' আরবীতে বলল ফিলিস্তিনি তরুণ।

রুদ্ধশ্বাসে পার হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ডগুলো। কেউ জানে না কী করতে হবে।

তারপর অকস্মাৎ ওদের বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠল সুরাইয়ার ওয়য়্যারলেস সেট। জয়তুন কোন মেসেজ দিতে চায়? নাকি সেটটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে ইজরায়েলিরা?

না, সুরাইয়ার কানে জয়তুনের কণ্ঠস্বরই; তবে তা মধু নয়, বর্ষণ করল গরল: 'পাশের বাড়ির এক মাগী টাকার লোভে সার্চ পার্টির ক্যাপটেনকে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘাঁটির কথা বলে দিয়েছে। ওই বাড়ির চাকরানি এইমাত্র খবরটা দিয়ে গেল আমাকে।'

সুরাইয়ার গলা ভেঙে গেল, 'এখন কী হবে?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, বোন,' জবাবে বলল জয়তুন। 'কথা দিয়েও আপনাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারলাম না। মেজর আবরা বিদেশী বন্ধুর কথা জানে, বিস্ফোরক দিয়ে দেয়াল-আলমারি উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছে।'

‘তুমি লুকিয়ে পড়ো, জয়তুন,’ তাগাদা দিল সুরাইয়া। ‘তোমাকে পেলে ওরা নির্যাতন করবে।’

‘বিপদ টের পেয়ে পাড়া থেকে সরে এসেছি,’ বলল জয়তুন। আমি এখন কেল্লার ছাদে। আমার মেয়েদের এখন আমি খবর পাঠাব, তারাও যেন সুযোগ বুঝে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কারণ আমি জানি আপনি বা ইউসুফ ইজরায়েলিদের হাতে ধরা দেবেন না, টন খানেক বিস্ফোরক আর একদল ইজরায়েলির সঙ্গে নিজেরাও উড়ে যাবেন।’

‘আমরা কী করব, কখন করব, একটু পরেই জানাচ্ছি। তুমি সেট খুলে রাখো,’ বলে যোগাযোগ কেটে দিয়ে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। ‘সত্যি সর্বনাশ হয়ে গেছে!’

‘বলো।’

‘ওরা সত্যি সত্যি জানে দেয়াল-আলমারির পিছনে এটা হামাসের একটা ঘাঁটি। এ-ও জানে যে তুমি এখানে লুকিয়েছ…’ কী ঘটেছে দ্রুত বলে গেল সুরাইয়া। সবশেষে বলল, ‘দুঃখিত, রানা। দিস ইজ দা এন্ড অভ দা রোড। এরপর আর পথ নেই।’

ফিলিস্তিনি তরুণ ইউসুফ আলখেল্লার সামনেটা খুলে জেলিগনাইটের সঙ্গে ডেটোনেটিং মেকানিজমের সংযোগগুলো পরীক্ষা করছে, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক চিলতে হাসি লেগে রয়েছে।

দেখাদেখি সুরাইয়াও তার বোরকা ফাঁক করে গায়ে জড়ানো বিস্ফোরক আর ডেটোনেটিং মেকানিজম খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। কোথাও একটু খুঁত থাকলে প্রয়োজনের সময় বিস্ফোরণ ঘটবে না।

‘একটু থামো,’ বলে ইউসুফের দিকে হাত বাড়াল রানা।

কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারেনি ইউসুফ, হ্যাঁচকা টান দিয়ে বিস্ফোরকের সঙ্গে জোড়া লাগানো এক গোছা তার ছিঁড়ে ফেলল রানা।

'রানা!' সুরাইয়া হতভম্ব। 'মানে?'

বন্ করে ঘুরে ফাঁক করা বোরকার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আরও এক গোছা তার ধরে টান দিল রানা। সুরাইয়া পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল, তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার।

'এর মানে?' অকস্মাৎ সাপের মত ফণা তুলল সুরাইয়া।

'তোমরা মরতে চাও মরো, আপত্তি করব না, হিসহিস করে বলল রানা। 'কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাকেও মরতে হবে কেন?'

'এতক্ষণ তা হলে কী বললাম তোমাকে?' সুরাইয়ার দৃষ্টি দেখে মনে হলো রানাকে বদ্ধ একটা উন্মাদ ভাবছে সে। 'ইজরায়েলিরা ইস্পাতের দরজা উড়িয়ে দেবে। তারপর ভেতরে ঢুকে পাখি শিকারের মত গুলি করবে আমাদের। আমরা তা হতে দিতে পারি না।'

'পারার মধ্যে পারো শুধু আত্মঘাতী হতে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বাঁচার কোন বুদ্ধি করতে পারো না?'

'জনাবের আপার চেম্বারে সে রকম কোন বুদ্ধি আছে কি?' হঠাৎ ইংরেজিতে জানতে চাইল ইউসুফ, বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য।

'আছে,' বলল রানা। সুরাইয়ার দিকে ফিরল। 'যদি সম্ভব হয়, ওদের আগে আমরাই ইস্পাতের দরজাটা উড়িয়ে দেব। ওটা ভাঙবার জন্য ওরা খুব বেশি হলে এক আধ পাউন্ড জেলিগনাইট ফাটাবে। আমরা ফাটাব...এই ধরো দুশো পাউন্ড, কিংবা আরও বেশি।

'ফলে কী হবে? গোটা পাড়াটাই উড়ে যাবে, তাই না? ধোঁয়া, আগুন আর আবর্জনা ছাড়া আরও একটা জিনিস দেখতে পাব আমরা।' ইউসুফের দিকে তাকাল। 'কী?'

ইউসুফ হাঁ হয়ে গেছে। জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল: 'ইজরায়েলি সৈন্যদের লাশ।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝলাম এটা একটা প্ল্যান,' বলল সুরাইয়া,

‘কিন্তু প্ল্যানটা কি আমাদের প্রাণ বাঁচাতে পারবে? না পারলে ওটার মূল্য কী?’

‘সে তো ঠিক কথাই,’ তার সুরে সুর মিলিয়ে বলল রানা। ‘তবে আমার ধারণা, প্রাণে আমরা বেঁচে যাব, শুধু তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করো, আর অযথা সময় নষ্ট না করো।’

সুরাইয়া আর ইউসুফ নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল। চোখে প্রত্যাশা নিয়ে আবার রানার দিকে ফিরল তারা।

‘জয়তুনকে জিজ্ঞেস করো, সে কি বলতে পারবে আলমারিতে বিস্ফোরক লাগানো হচ্ছে কিনা,’ বলল রানা। তারপর ইউসুফের দিকে তাকাল। ‘এক ছুটে এক বাক্স জেলিগনাইট আর ডেটোনেটর নিয়ে এসো, যাও। আর আলখেল্লার পকেটে ভরে কিছু গ্রেনেডও।’

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ছুটে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইউসুফ।

‘জয়তুন? সুরাইয়া,’ ওয়য়্যারলেসে কথা বলছে সুরাইয়া। ‘তোমার বাড়িতে কী ঘটছে খবর পাচ্ছ?’

জয়তুনের জবাব শুনবার জন্য ওয়য়্যারলেসের স্পিকারের কাছে নিজের একটা কান যতটা পারা যায় সরিয়ে আনল রানা।

‘আমার মেয়েরা এখনও রয়েছে ওখানে, একজনের কাছে একটা ওয়য়্যারলেসও আছে,’ বলল জয়তুন, ‘কিন্তু সেটা বন্ধ। মেয়েটা ধরা পড়ে গেছে কি না বুঝতে পারছি না।’

‘আলমারিতে বিস্ফোরক বসাতে কতক্ষণ লাগবে ওদের, পাড়ায় এই মুহূর্তে আন্দাজ কত সৈন্য আছে, তোমার মেয়েরা পাড়া ছাড়তে কতক্ষণ সময় নেবে, এ-সব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চাই আমরা।’

‘পাঁচ-সাত মিনিট পর যোগাযোগ করুন,’ বলল জয়তুন। ‘বিস্ফোরক আনতে লোক গেছে, ফিরতে কিছু দেরি হবে, এটুকু জানি। বাকি সব খবর নিচ্ছি।’

‘আরও কথা আছে,’ বলল রানা।

‘লাইনে থাকো, জয়তুন,’ বলল সুরাইয়া।

‘যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন,’ জয়তুন উত্তেজিত। ‘নীচে রাস্তা থেকে একজন সৈনিক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।’

‘আমাদের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করো ওকে,’ সুরাইয়াকে নির্দেশ দিল রানা। ‘গোটা পাড়া উড়িয়ে দেব। তারপর আগুন আর আবর্জনার ভিতর দিয়ে ছুটব। সৈন্য দেখলেই গ্রেনেড ছুঁড়ব। জয়তুন আমাদেরকে ওয়্যারলেসে পথ নির্দেশ দেবে, আমরা ওর কাছে পৌঁছাব। কেন?

‘ক্যাপটেন র‍্যাঙ্কের একজোড়া ইউনিফর্ম যোগাড় করে রাখবে সে–একটা লেডিস, একটা জেন্টস–আমরা ওগুলো নেয়ার জন্যে যাব।’

খানিক পরপর সুরাইয়ার সঙ্গে কথা বলছে জয়তুন।

নতুন নতুন তথ্য পাওয়ায় দুশো গজ লম্বা টানেলের কোথায় কী পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহার করতে হবে, হিসাব করতে সুবিধে হচ্ছে রানার। ইতিমধ্যে সুরাইয়া আর ইউসুফের সাহায্যে আন্ডারগ্রাউন্ড হামাস ঘাঁটির উপর কোথায় কী আছে তার একটা নকশা তৈরি করেছে ও।

বিস্ফোরণ ঘটবে পতিতালয়ের পাঁচ জায়গায়। জয়নালের দেওয়া তথ্য অনুসারে, পাড়ার ভিতর ইজরায়েলিদের সংখ্যা আশি জনের কম নয়, দুই প্রবেশ পথে দুটো ট্যাংকও মোতায়েন করা হয়েছে।

জয়তুনের বেডরুম হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড ঘাঁটিতে পৌঁছানো যায়, এ তথ্য পেলেও ইজরায়েলি ক্যাপটেন বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েটার কাছ থেকে জানতে পারেনি দেয়াল-আলমারির ঠিক পিছনে আসলে কী আছে। ফলে প্রথমে তারা আলমারি খুলে চেষ্টা করল পিছনের দেয়ালটা ভাঙা যায় কি না। এতে বেশ কিছুটা সময় ব্যয়

হলো।

সেই সময়টাই কাজে লাগাল রানা।

জয়তুনকে দু'বার প্রশ্ন করা হলো, সৈনিকটা কি এখনও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে? দু'বারই জয়তুন জবাব দিল, নীচের রাস্তায় তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না।

না পারারই কথা, কারণ অন্য এক রাস্তায় সরে গিয়ে জয়তুনকে পিছন থেকে দেখছে সে।

ইতিমধ্যে জানা গেছে, জয়তুনের প্রতিবেশী মেয়েটার পেটে কে যেন ছুরি চালিয়েছে। নিজের বাড়ির গেটের ঠিক বাইরেই কাত হয়ে শুয়ে আছে সে, বিস্ফারিত চোখে দেখছে সদ্য বেরিয়ে আসা নিজের নাড়িভুঁড়ি। রাস্তা দিয়ে গটগট করে হেঁটে যাচ্ছে ইজরায়েলি সৈন্যরা। গলা থেকে চিঁ-চিঁ আওয়াজ বের করে তাদের সাহায্য চাইছে মেয়েটা। ঘৃণার সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে তারা।

জয়তুনকে জানিয়ে দেওয়া হলো, বিস্ফোরক বসানোর কাজ শেষ করেছে ওরা। কোন সমস্যা না থাকলে পাড়াটা এখনই রানা উড়িয়ে দিতে পারে।

জয়তুন মেসেজ দিল, 'সমস্যা আছে।'

ভুরু কোঁচকাল সুরাইয়া। 'মানে?'

'আপনারা না তখন বললেন, মেজর আবরা যেন মরে? এখন পাড়া উড়িয়ে দিলে সে মরবে না।'

'মরবে না...কী বলছ তুমি?'

'সে তার লোকজনকে আলমারির পিছনে বিস্ফোরক বসাতে বলে পাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

'কেন?'

'আমি তাকে কেল্লার ছাদ থেকে নীচের রাস্তায় দেখতেও পাচ্ছি,' বলল জয়তুন। 'দাঁড়ান, বিনকিউলারটা অ্যাডজাস্ট করে নিই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মেজর আবরা সাদা প্যান্ট শার্ট পরা এক

লোকের সঙ্গে কথা বলছে।'

জয়তুনের কথা রানাও শুনছে। আরবীতে প্রশ্ন করল ও: 'লোকটা দেখতে কেমন?'

জয়তুনের মুখে বর্ণনা শুনে ওর আর বুঝতে বাকি থাকল না যে লোকটা এবরান বারাইদি।

'ওকে আমার দরকার।' জয়তুনকে বলল ও। 'কোথায় যায়, কী করে লক্ষ রাখুন। ভাল কথা, ইউনিফর্মের ব্যবস্থা ...'

'ওগুলো যোগাড় করতে হয়নি,' রানা প্রশ্নটা শেষ করবার আগেই জবাব দিল জয়তুন। 'কেল্লার একজনের কাছে আছে শুনে আনিয়ে রেখেছি। শুনুন, হুজুর...'

'হ্যাঁ, বলুন। তবে আমি হুজুর বা সার নই।'

'মেজর আবরা ফটক থেকে আবার কেল্লার ভেতর ঢুকছে...'

'আর লোকটা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল,' বলে হেসে উঠল জয়তুন।

'এই হাসির নিশ্চয় কোন মানে আছে।'

'তুফা শহরের সব হামাস সদস্য জড়ো হয়েছে ওই রেস্তোরাঁর পিছনের কামরায়। কেল্লার ভেতর এতগুলো ইজরায়েলি সৈন্যকে এক সঙ্গে পেয়ে ছেড়ে দিতে রাজি নয় ওরা।'

'ওদেরকে খবর পাঠাননি যে যা করবার আমরাই করব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাঠিয়েছি খবর। আপনারা কী করেন দেখার অপেক্ষাতেই ওখানে বসে আছে ওরা। আপনারা ব্যর্থ হলে কিছু একটা করবে ওরা।'

'জানি খুব বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'তবে সত্যি খুব ভাল হত হামাসরা যদি লোকটার গায়ে বিস্ফোরক বসিয়ে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রের সাহায্যে ওটা ফাটাবার ব্যবস্থা করে রাখত।'

'কী লাভ হত তাতে?'

'মেজর এবরান বারাইদির প্রাণ ভোমরাটা থাকত আমার হাতে,' বলল রানা। 'তা থাকলে তাকে দিয়ে আমি যেমন খুশি তেমন গান গাওয়াতে পারতাম।'

'শুনুন, মেজর আবরা একজন ট্যাঙ্ক কমান্ডারের সঙ্গে কথা বলছে,' বলল জয়তুন। 'ট্যাঙ্ক কমান্ডার ইঙ্গিতে কেল্লার ছাদ দেখাল মেজরকে...আমাকে ছাদে একা দেখে হয়তো সন্দেহ হয়েছে তার। শুনুন, পরে কথা বলব।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আবার যোগাযোগ করল জয়তুন বারো মিনিট পর।

'কী খবর?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'মেজর আবরা কোথায়?'

জয়তুন বলল, 'একদল সৈনিককে নিয়ে আমার বাড়ির দিকে এগোচ্ছে মেজর আবরা। আর বড় জোর এক মিনিট, তারপরই আমি তাকে দেখতে পাব না।'

'শুনুন,' বলল রানা। 'আবরা চোখের আড়াল হওয়া মাত্র জানাবেন আমাকে। তারপর আমি ত্রিশ পর্যন্ত গুণে ফাটিয়ে দেব সব।'

সাত

কেল্লাটা পাথরের তৈরি হলেও, কয়েকশো বছরের পুরানো। সেই কেল্লার ভিতর, বড় একটা উঠানের নীচে, জোরাল বিস্ফোরণ ঘটলে তার ধাক্কা কতটা সামলাতে পারবে বলা মুশকিল।

বিস্ফোরক বসাবার সময় কথাটা মাথায় রাখতে হয়েছে রানাকে।

তবে পতিতালয়ের চারপাশে মসজিদ, গির্জা, আর খোলা মাঠ থাকায় নিরীহ মানুষ হতাহত হওয়ার তেমন আশঙ্কা নেই।

দুশো গজ টানেলের পাঁচ জায়গায়, আর ইস্পাতের দেয়ালে, মোট এই ছ'জায়গায় বিস্ফোরক বসানো হয়েছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল বিস্ফোরণ থেকে বাঁচবার জন্য কুয়ার কাছাকাছি, সিঁড়ির ধাপে আশ্রয় নেবে ওরা। কিন্তু পরে চিন্তাটা বাতিল করে দিতে হয়েছে।

ইজরায়েলিরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কুয়াটাকে বুজিয়ে দিয়েছে, ফলে ওদিক দিয়ে বেরুবার কোন উপায় নেই। এখন যদি কুয়ার কাছাকাছি আশ্রয় নিয়ে টানেলের পাঁচ জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, প্রাণ নিয়ে মাটির উপর উঠতে পারবে কোন দিন? টানেলটা তো সম্পূর্ণই ধসে পড়বে, প্রায় গোটা পতিতালয় নিয়ে।

চিন্তা-ভাবনা করে দু'দফা বিস্ফোরণ ঘটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা। প্রথম বার টানেলে বসানো বিস্ফোরকগুলো ফাটানো হবে, ওরা তখন থাকবে আলমারির পিছনের ঘরটায়।

ওই ঘরের ইস্পাতের দেয়ালে ফিট করা বিস্ফোরক ফাটানো হবে বিশ কি ত্রিশ সেকেন্ড পর, ওরা তখন থাকবে ওই ঘরের ঠিক বাইরে–টানেলের যে অংশে বিস্ফোরক বসানো হয়নি।

কেল্লার ছাদ থেকে মেজর আবরাকে অনুসরণ করছে জয়তুনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। এই লোক বডিগার্ডদের নিয়ে চোখের আড়াল হোক, সঙ্গে সঙ্গে সুরাইয়ার বিদেশী বন্ধুকে খবরটা জানিয়ে দেবে সে।

এই সময় হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল ওয়য়্যারলেস সেট।

'একটুর জন্যে ধরা পড়িনি!' অপর প্রান্ত থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে রিপোর্ট করল একটা মেয়ে। 'রেস্তোরাঁর পিছনের কামরায় এসে দেখে কেউ নেই। ট্র্যাপ ডোর খুলে আন্ডারগ্রাউন্ডে নেমে এসে দেখি একটা পাগলকে বেঁধে রেখে সবাই চলে গেছে।'

‘পাগল? এর মধ্যে আবার পাগল এল কোত্থেকে?’

‘তা আমি কী করে বলব! লোকটা গলায় এমনভাবে আঙুল ঢোকাচ্ছে, পারলে যেন গোটা হাতটাই সেঁধিয়ে দেয়।’

‘এই না বললি তাকে বেঁধে রেখে গেছে!’

‘গেছেই তো, তবে শুধু পা দুটো।’

‘ঠিক আছে, ওই লোকের নাগালের বাইরে ব্যাগটা রেখে চলে আয় তুই,’ নির্দেশ দিল জয়তুন।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। পরমুহূর্তেই রানার সঙ্গে যোগাযোগ করল: ‘মেজর আবরাকে এই মু-হূ-র্ত থে-কে আ-মি দে-খ-তে পা-চ্ছি…না!’

‘ধন্যবাদ,’ রানার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল জয়তুনের কানে।

জানে রানা গুণছে, ওর সময়ের সঙ্গে থাকবার জন্য জয়তুনও গুণতে শুরু করল: ‘এক…দুই…তিন…চার…’

নীচের রাস্তা থেকে ইজরায়েলি সৈনিক দেখল কেল্লার ছাদে বোরকা পরা নিঃসঙ্গ মেয়েটা কার সঙ্গে যেন ওয়য়্যারলেসে কথা বলছে। কোমরে আটকানো ওয়াকি-টকি মুখের সামনে তুলে মেজর আবরার সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

বেশ্যাপাড়ায় ফিরে জয়তুনের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে মেজর আবরা, সঙ্গে বডিগার্ড ছাড়াও একজন ক্যাপটেনের অধীনে কয়েকজন সৈনিক রয়েছে। পাড়ার বাড়িগুলো সব খালি দেখে ক্যাপটেনকে প্রশ্ন করতে যাবে, এই সময় ওয়াকি-টকি জ্যান্ত হয়ে উঠল।

‘মেজর আবরা।’ ওয়াকি-টকি মুখের সামনে তুলল সে।

সৈনিক নিজের পরিচয় দিয়ে রিপোর্ট করল: ‘কেল্লার ছাদে একা একটা মেয়ে। চোখে বিনকিউলার দেখে আমার সন্দেহ হয়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর এখন দেখছি ওয়য়্যারলেসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।’

‘কিল হার!’ নির্দেশ দিল মেজর আবরা।

‘সার!’ সৈনিক ভাবল, ভুল শুনেছে। মেয়েটার যেহেতু পালাবার উপায় নেই, সে আশা করছিল মেজর তাকে ধরে এনে ইন্টারোগেট করতে চাইবে।

‘কিল হার!’ এবার গর্জে উঠল মেজর আবরা।

ওয়াকি-টকি বন্ধ করে কাঁধ থেকে একে-ফোরটিসেভেন নামাল সৈনিক। তার এই অটোমেটিক রাইফেলে টেলিস্কোপ লাগানো আছে।

কিন্তু সব বৃথা হয়ে গেল আপাতত। ছাদের কিনারা থেকে সরে গেছে মেয়েটি। তার মাথার উপরের অংশটুকু, ইঞ্চি দেড়েক, দেখা যাচ্ছে শুধু। এত দূর থেকে ওটাকে টার্গেট করা সম্ভব নয়।

অপেক্ষায় থাকল সৈনিক।

জয়তুন গুণছে: ‘পঁচিশ...ছাব্বিশ...সাতাশ...’

মেজর আবরা জয়তুনের বাড়িতে ফিরে এসেছে। এই মুহূর্তে বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, সেই রহস্যময় দেয়াল-আলমারিটার সামনে। এখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল কয়েকজন সৈনিক।

আলমারির পিছনে ইস্পাতের দেয়াল পাওয়া গেছে। সৈনিকরা তাতেই বিস্ফোরক বসিয়েছে। এখনই ফাটানো হবে বিস্ফোরক, কাজটায় কোন খুঁত আছে কিনা মেজর আবরা দেখে নেওয়ার পর।

রানা গুণল–ত্রিশ।

জয়তুন গুণল–ত্রিশ।

কেল্লাটা অকস্মাৎ এমন দুলে উঠল, তাল সামলাতে না পেরে ছাদে পড়ে গেল জয়তুন। দোলাটা থামতে দেরি হচ্ছে দেখে জয়তুন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ভাবল, এতদিনের পুরানো কেল্লা না পড়ে যায়।

পাঁচিল ধরে দাঁড়াল সে। দোলাটা থেমে গেছে। কেল্লা পড়েনি। সে তার পাড়ার দিকে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেল।

জয়তুন না দাঁড়ালে এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হত। তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে পতিতালয়ের একটা অংশ এখনও মাটির তলায় ডেবে যাচ্ছে।

টানেলে বিস্ফোরণ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে টহলরত সৈনিকদের নিয়ে পাড়ার এই অংশটা ধসে পড়েছিল। কাত হওয়া বাড়ি-ঘরের নীচে চাপা পড়া ইজরায়েলি সৈনিক যারা তখনও মারা যায়নি তারা ভাঙা দেয়াল আর আবর্জনা সরিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু দেখল মাটির তলায় আরও ডেবে যাচ্ছে জমিন।

বিস্ফোরণের পর মাত্র দশ কি পনেরো সেকেন্ড পার হয়েছে, অভিশপ্ত ইজরায়েলি সৈনিকদের উপর ব্রাশ ফায়ার শুরু করল হামাস সদস্যরা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পাড়ার কাছাকাছি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল তারা। এমন সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়—আত্মঘাতী না হয়েও ডজন ডজন ইজরায়েলি সৈন্যকে খতম করা যাচ্ছে।

ওদের লিডার ভাবছে, যিনি ওদেরকে এ রকম একটা সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি শুধু বিদেশী শুভানুধ্যায়ী হতে পারেন না, ইনি নিশ্চয়ই আল্লাহর তরফ থেকে পাঠানো কোন ফেরেশতা হবেন।

জয়তুনের বেডরুমে যারা ছিল তারা প্রথমে ভাবল ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই, সবার আগে রয়েছে মেজর আবরা। কিন্তু দেখা গেল বাইরের পাহারাদার সৈনিকরা ছুটে ঘরে ঢুকতে চাইছে। হইচই আর চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে জানা গেল, পাড়ার মধ্য আর দক্ষিণ ভাগ ধীরে ধীরে মাটির তলায় নেমে যাচ্ছে। সেই ভূমিধসের নীচে পড়া আহত সৈন্যদের পাখির মত গুলি করে মারছে হামাস।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবণতা মেজরসহ সৈনিকদের আবার জয়তুনের বেডরুমে তাড়িয়ে নিয়ে এল।

আর ঠিক তখনই ঘটল আরেক দফা বিস্ফোরণ।

লোহার ফ্রেমে ইস্পাতের পাত দিয়ে বানানো দেয়াল ছিটকে এসে পড়ল বেডরুমের ভিতর। বিস্ফোরণের ধাক্কাতেই মেজর আবরা আর সৈনিকদের প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার কথা, তা না হলে ভারী দেয়ালটা সবার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই অসমাপ্ত কাজটা নিশ্চয়ই শেষ করেছে।

ছিটকে পড়া ইস্পাতের দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটছে রানা, পিছনে সুরাইয়া আর ইউসুফ। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র, জয়তুনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তীর বেগে, ছুটছে উত্তর দিকে। ওয়য়্যারলেস সেটটা কানে চেপে ধরেছে রানা।

বিস্ফোরণের ত্রিশ সেকেন্ড পর কেল্লার ছাদ থেকে ওদেরকে দেখতে পেল জয়তুন–পাড়ার যে অংশটা তার দৃষ্টিপথের মধ্যে, ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল সেখানে। প্রথমে রয়েছে রানা, তারপর সুরাইয়া, সবশেষে ইউসুফ।

'আপনাদের এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সিঁড়ির দিকে আসবেন না,' রানাকে বলল জয়তুন। 'কেল্লার ছাদে ওঠার দরকার নেই। বাঁ দিকের গলিটা ধরে আরেক উঠানে বেরোন–রেস্তোরাঁটা ওদিকেই। ওই রেস্তোরাঁর পিছনের ঘরে ঢুকবেন। কার্পেট সরালে একটা ট্র্যাপ...'

'ওখানে কেন যেতে হবে?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে আমার তরফ থেকে আপনার জন্যে একটা তোফা আছে, হুজুর...সরি, ভাই।'

'কিন্তু আপনাকে যে ইউনিফর্মের কথা বলেছিলাম...'

'একটা ব্যাগে পাবেন,' বলল জয়তুন, ছাদের কিনারা ধরে হাঁটছে সে, জানে একটু পরই দৃষ্টি পথের আড়ালে চলে যাবে রানা।

'মেজর বারাইদির খবর কিছু জানেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নীচের রাস্তা থেকে তার টার্গেট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে

ইজরায়েলি সৈনিক। টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে একে-ফোরটিসেভেনের ট্রিগার টেনে দিল সে।

কাছাকাছি থেকে হামাসের অবিরাম গুলি বষর্ণের আওয়াজ ভেসে আসছে, ফলে সৈনিকের গুলির শব্দ রানা শুনতে পাবে না। তবে জয়তুন জবাব দিতে দেরি করছে বলেই হোক বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনাতেই হোক, ঘাড় ফিরিয়ে কেল্লার ছাদের দিকে তাকাল ও।

দুর্গ প্রাকারের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জয়তুন। অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো কালো কাপড়ে ঢাকা তার খুলি। বেলা দুটোর তেতে ওঠা ফিলিস্তিনি রোদে টকটকে লাল কুয়াশা বা ধোঁয়ার মত দেখা গেল ঠিক যেখানটায় তার মাথা ছিল। বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওগুলো রক্তকণা, বাষ্পের মত উড়ে গেল বাতাসে।

জয়তুনের শরীরটা আগেই ছাদের মেঝেতে পড়ে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেছে।

ট্র্যাপডোর খুলে মাটির তলার ঘরটায় নামছে রানা। পায়ে লোহার আঙটা পরানো, আঙটার সঙ্গে শিকল রয়েছে, জানালার গ্রিলে আটকানো মেজর এবরান বারাইদিকে এই অবস্থায় দেখে খুব যে একটা অবাক হলো, তা নয়। তবে ওকে বিমূঢ় করে তুলল মোসাদ এজেন্টের নোংরা আচরণ।

গলায় আঙুল দিয়ে মেঝেতে প্রচুর বমি করেছে বারাইদি, আর সেই বমি আঙুল দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

'কী হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল বারাইদি। সিঁড়ি বেয়ে রানাকে নেমে আসতে দেখে স্থির হয়ে গেল সে। 'না, কই, কিছু হয়নি—আমি অসুস্থ,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল সে।

সিঁড়ির পাশেই একটা টেবিল, তাতে রাখা ক্যানভাসের পেটমোটা ব্যাগটার উপর চোখ পড়ল রানার। পিছন দিকে

তাকিয়ে সুরাইয়াকে বলল, 'ইউনিফর্ম বের করে তাড়াতাড়ি পরে নাও। জায়গাটা বিপজ্জনক।'

'চিন্তা কোরো না,' দ্রুত বলল সুরাইয়া। 'ইউসুফ নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও আমাদেরকে রক্ষা করবে।'

ব্যাগটার পাশে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র দেখতে পেল রানা, পেপার ওয়েট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। একপাশে লোহার একটা চাবিও পড়ে রয়েছে।

যন্ত্রটা সরিয়ে কাগজটার ভাঁজ খুলল রানা। আরবী হরফে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে: 'জয়তুনের অনুরোধে মোসাদ এজেন্টের প্রাণ ভোমরা আপনার হাতে তুলে দেওয়া হলো। বারাইদিকে আড়াই ইঞ্চি লম্বা একটা ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। ক্যাপসুলের ভিতর বিস্ফোরক আছে, রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটার সাহায্যে দুশো গজ দূর থেকে ফাটানো যাবে। তবে দশ ফুট দূর থেকে ফাটালেও ভয়ের কিছু নেই, আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

'যন্ত্রের লাল বোতামটায় তিনবার চাপ দিতে হবে। আশা করি বারাইদিকে নিজের মনের সাধ মিটিয়ে গান গাওয়াতে পারবেন আপনি।'

'হ্যাঁ, শুরু করতে পারো তুমি,' সুরাইয়ার হাত থেকে এক সেট ইউনিফর্ম নিয়ে পরছে রানা, তাকিয়ে আছে বারাইদির দিকে।

'মানে?' বোকা সাজবার ভান করল বারাইদি।

'বমি তো যা করার করেছ। আরও যদি করতে পারো করো, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হবে না। কারণ ক্যাপসুলটা আকারে এত বড় যে ওপরে ওঠার সময় বাধা পাচ্ছে। তারচেয়ে তোমাদের নতুন অস্ত্র আর নাজাফি সম্পর্কে যা জানো সব বলে ফেলো। আমার যদি দয়া হয়, প্রাণে বাঁচবার একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারো।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

‘পারছ, পারছ। তুমি আমার সঙ্গে নাজাফি পর্যন্ত যাচ্ছ, কাজেই মিথ্যে কথা বলছ কিনা ধরে ফেলব আমি। মনে রেখো, রিমোটটা আমার কাছে।’

দরদর করে ঘামছে বারাইদি। শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল।

‘দাও, রিমোটটা আমাকে দাও,’ হঠাৎ হাত পাতল সুরাইয়া। ‘একটা মোসাদ মেরে কিছুটা পুণ্য অর্জন করি।’

হঠাৎ হেসে উঠল বারাইদি। তারপর ঝট করে হাসি থামিয়ে কর্কশ ঘরঘরে কণ্ঠে বলল, ‘আমি যদি সব কথা তোমাদের জানিয়েও দিই, ইজরায়েলের তাতে কোনও ক্ষতি হবে না। তবে তার আগে জানতে হবে, আমার কি সত্যি কোন লাভ হবে?’

‘হ্যাঁ, হবে,’ বলল রানা। ‘তোমাকে মেরে না ফেলে কোথাও আটকে রাখব আমরা। তুমি নিজেই নিজের চেষ্টায় সেখান থেকে মুক্ত হতে পারবে, তবে আমি ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে যাবার পর।’

‘তোমরা যে বেঈমানী করবে না, তার নিশ্চয়তা কী?’

‘কোন নিশ্চয়তা নেই। তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে।’ হাসল রানা। ‘এটা জুয়া, বারাইদি। যেহেতু হারাবার কিছু নেই, তোমার খেলাই উচিত।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বারাইদি কাঁধ ঝাঁকাল। ‘তোমাকে আমি একজন ভদ্রলোক বলেই জানি, রানা। কাজেই তোমার কথায় বিশ্বাস রাখছি। তবে আরেকটা প্রতিশ্রুতি চাই আমি।’

‘কী?’

‘তোমার সঙ্গিনীর হাতে রিমোটটা দিতে পারবে না।’

‘ঠিক আছে,’ হাসি চেপে বলল রানা।

‘বলো, প্রথমে কী জানতে চাও তুমি?’

‘তুমি আগাগোড়া যা জানো, গড়গড় করে বলে যাবে সব,’ বলল রানা। ‘মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করব আমি। তবে এখনই নয়।’

কাপড় ছেড়ে ইউনিফর্ম পরা হয়ে গেল রানা আর সুরাইয়ার।

আলখেল্লা খুলে ফেললেও, ইউনিফর্মটা নিজের শার্ট আর ট্রাউজারের উপরে পরেছে রানা। আলখেল্লার পকেটে যা যা ছিল সব এখন ওর ট্রাউজার বা ইউনিফর্মের পকেটে জায়গা করে নিয়েছে।

সুরাইয়াও শুধু বোরকাটা ছাড়ল, সালোয়ার-কামিজের উপর বাঘের ছাপ মারা উর্দি পরেছে।

'রাইট,' রানা থামতে সুরাইয়া বলল, 'আগে এই জায়গা থেকে বেরোই আমরা।'

টেবিল থেকে লোহার চাবিটা তুলে নিয়ে শিকলের তালা খুলল রানা। শিকল মুক্ত হয়ে টলোমলো পায়ে দাঁড়াল বারাইদি।

রানার হাতে রিমোট নয়, পিস্তল; ইঙ্গিতে সামনে থাকতে বলল বারাইদিকে।

ট্র্যাপডোর খুলে রেস্তোরাঁর পিছনের কামরাটায় উঠে এল ওরা। রেস্তোরাঁর একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে রাস্তার উপর নজর রাখছিল ইউসুফ, ওদের আওয়াজ শুনে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

'চারদিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা,' বলল সে। 'তবে এদিকে আসছে না।'

'তা না এলেও, বারাইদিকে নিয়ে রাস্তায় বেরুনো সম্ভব নয়,' বলল সুরাইয়া। 'অফিসারদের অনেকেই ওকে দেখা মাত্র চিনে ফেলবে।'

'চিনলে তো আরও ভাল,' বলল রানা। 'তাদেরকে বারাইদি বলতে পারবে, তাড়াতাড়ি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, আমরা নাজাফিতে যাব।'

'তুমি বলতে চাইছ, বারাইদি আমাদেরকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে না?'

'রিমোটের কথা ভুলে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা,

তারপর মাথা নাড়ল।

‘জুয়াটা আমি খেলব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,’ আত্মসম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য কিছু বলতে হয়, তাই বলছে বারাইদি। ‘তা ছাড়া, আত্মহত্যা করাটাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কাপুরুষতা বলে মনে করি।’

‘ইউসুফ,’ বলল রানা। ‘বিদায়। আমরা বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর বেরুবে তুমি। কোথায় যাবে?’

‘কেল্লার দক্ষিণ দিকটায়,’ জবাব দিল ইউসুফ। ‘ইজরায়েলিদের সঙ্গে গানফাইটটা ওদিকেই সরে গেছে বলে মনে হয়।’

‘শুভেচ্ছা রইল, ইউসুফ,’ বলল সুরাইয়া।

দরজা খুলে রেস্তোরাঁর ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল ইউসুফ। রাস্তা, রাস্তার পর উঠান পড়ে আছে; না আছে সৈন্যদের টহল, না আছে লোকজনের চলাচল।

প্রথমে সুরাইয়া বেরুল–সুদর্শনা ক্যাপটেন, চেহারা আর হাঁটাচলায় দৃঢ়তা, তবে কী কারণে যেন ব্যস্ত। তার পিছনে রানা–স্মার্ট, সুপুরুষ, চেহারায় আর হাবভাবে কাঠিন্য। ওর পাশে দীর্ঘকায় মোসাদ এজেন্ট–উদ্বিগ্ন, ক্লান্ত।

রানা আর বারাইদি নিচু গলায় আলাপ করছে। যা বলবার গড়গড় করে বারাইদিই বলছে, রানা শুধু মাঝে মধ্যে দু’একটা প্রশ্ন করছে।

কেল্লার প্রধান ফটক এড়িয়ে অন্য পথ ধরে এগোচ্ছে সুরাইয়া। দূর থেকেই ট্যাংক আর সৈনিকদের জটলা দেখা যাচ্ছে ওদিকে। মিনিট তিনেক এ-গলি সে-গলি ধরে হাঁটল, তারপর ভাঙা একটা পাঁচিল টপকে ওদেরকে বের করে আনল বাইরে।

কেল্লার বাইরেও শহরের পরিবেশ থমথম করছে। ট্যাংক আর ট্রুপস ক্যারিয়ার দাঁড়িয়ে আছে। বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা হেভি মেশিন গান দেখা যাচ্ছে। ধুলো উড়িয়ে একটা জিপ ছুটে

গেল–পাঁচজন আরোহী। সেটার পিছু নিয়ে আরেকটা আসছে–এটায় ড্রাইভার একা।

রাস্তার প্রায় মাঝখানে চলে এল রানা আর সুরাইয়া, বারাইদিকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রেখেছে। ড্রাইভারের উদ্দেশে একটা হাত এমন ভাবে তুলল, ওটা যেন একটা ব্যারিয়ার।

দ্রুত ব্রেক কষে ওদের পাশে জিপ থামাল ড্রাইভার। ইউনিফর্ম বলে দিল সে একজন লেফটেন্যান্ট।

হুইল থেকে একটা হাত তুলে স্যালুট করল লেফটেন্যান্ট। 'ইয়েস, সার?'

জবাবে কেউ কিছু না বলে দ্রুত উঠে বসল জিপে। বারাইদিকে নিয়ে রানা উঠল পিছনে। সুরাইয়া বসেছে লেফটেন্যান্টের পাশের সিটে।

'তুমি নাজাফিতে যাচ্ছ, তাই না?' পিছন থেকে আরবীতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, সার,' হিব্রু ভাষায় জবাব দিল ড্রাইভার, ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

'যাচ্ছ,' বলল সুরাইয়া, হিব্রু ভাষায়।

সুরাইয়াকে দেখল লেফটেন্যান্ট। 'আ-আ-প-নি...' সুরাইয়াকে চিনতে পেরেছে সে।

'হ্যাঁ, আমি,' চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল সুরাইয়া। 'জিপ ছাড়ো!'

'কিন্তু আমি তো মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি, ক্যাম্প লিডারকে রিপোর্ট করতে।' ঘাড় ফেরাতে রানার হাতে পিস্তল দেখতে পেল সে–বারাইদির দিকে তাক করা।

হাতের পিস্তলটা ড্রাইভারের পাঁজরে চেপে ধরল সুরাইয়া। 'আবার বলো, কোথায় যাচ্ছ?'

জিপ ছেড়ে দিল লেফটেন্যান্ট। 'আপনারা যেখানে বলবেন,' বিড় বিড় করল সে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

‘তোমার আর তোমার কমান্ডিং অফিসারের নাম বলো,’ খানিক পর ইংরেজিতে জানতে চাইল রানা।

সুরাইয়ার দিকে ফিরে লেফটেন্যান্ট বলল, সে ইংরেজি জানে না।

‘আমরা তা হলে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে পারি,’ সুরাইয়াকে বলল রানা, পাশের সিটে বসা বারাইদির উপর থেকে ভুলেও চোখ সরাচ্ছে না।

‘পারি।’ মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া।

‘বারাইদি বলছে,’ শুরু করল রানা, ‘বছর তিনেক আগে নাজাফির স্পেস সেন্টার থেকে বিদেশী বিজ্ঞানীদের সহায়তা নিয়ে মহাশূন্যে একটা স্পেস স্টেশন পাঠিয়েছে ইজরায়েল।’

‘ওখান থেকে রকেট-টকেট ছোঁড়া হয় বলে শুনেছি,’ বলল সুরাইয়া। ‘নিশ্চয়ই অরবিটিং ল্যাবরেটরির কথা বলছে।’

‘না, সুরাইয়া। ওটা পুরোদস্তুর একটা স্পেস স্টেশন। ওটার নাম অ্যাবি। অ্যাবির এক প্রান্তে অত্যন্ত সফিস্‌টিকেটেড একটা মিলিটারি পোস্টও বসিয়েছে ওরা।’

‘মানে? মহাশূন্যে মিলিটারি পোস্ট কী কাজে আসবে?’ সুরাইয়ার কান যেদিকেই থাকুক, চোখ দুটো শুধু রাস্তা আর লেফটেন্যান্টকে নিয়ে ব্যস্ত।

‘বারাইদি বলছে, অ্যাবির বাইরে ওরা কাঁচ বসিয়েছে। সাধারণ কাঁচ নয়, ম্যাগনিফাইং। ফ্রেমে আটকানো ওই কাঁচ ঘুরিয়ে পৃথিবীর যে-কোন এলাকায় ফোকাস করা যায়। রোদকে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ গুণ উত্তপ্ত করা যায় ওটার সাহায্যে। যে-কোন জিনিস, ইস্পাত পর্যন্ত চোখের পলকে গলিয়ে ফেলা যায়।’

খবরটা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল সুরাইয়া।

ইতিমধ্যে শহর পিছনে ফেলে ঊষর মরুভূমিতে বেরিয়ে এসেছে ওদের জিপ। দূরে দু’সারি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। সরল

রাস্তাটা সেদিকেই এগিয়েছে।

'ওটাকে ওরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে? ওই তাপকে?' অবশেষে জানতে চাইল সুরাইয়া।

'হ্যাঁ। বারাইদি বলছে, অস্ত্রটা নিয়ে এখনও এক্সপেরিমেন্ট করছে ইজরায়েলি বিজ্ঞানীরা। তাদের ধারণা, এই অস্ত্রের কাছে পারমাণবিক বোমা কিছুই নয়।'

'ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

'অনেকটাই করি,' বলল রানা। 'কারণ অস্ত্রটা কতটুকু কী ক্ষতি করতে পারে, সে-সম্পর্কে আমার ধারণা আছে।'

'এখন তা হলে একটা প্ল্যান তৈরি করতে হয়,' বলল সুরাইয়া। 'কী ভাবে নাজাফি স্পেস সেন্টার ধ্বংস করা যায়।'

রানা কিছু বলবার আগে হেসে উঠল মোসাদ এজেন্ট বারাইদি। 'সিকিউরিটি এত কড়া যে স্পেস সেন্টারে তোমরা ঢুকতেই পারবে না,' হাসি থামিয়ে বলল সে। 'আর ঢুকলেই বা কী, অস্ত্রটা তোমরা পাচ্ছ কোথায়? ওটা তো মহাশূন্যে—স্পেস স্টেশনে। আমাদের বিজ্ঞানীরা খেয়াযান জুবিলিতে চড়ে আসা-যাওয়া করে, কিন্তু তোমরা তো ওটার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।'

রানার মাথায় একের পর এক আইডিয়া আসা-যাওয়া করছে। একটা স্পেস স্টেশনে প্রচুর পরিমাণে লাফিং গ্যাস পাওয়া যায়। স্পেস স্টেশনে সাপ্লাই দেওয়া হবে, এরকম অক্সিজেন ট্যাংকে ওই লাফিং গ্যাস ভরে দিলে কেমন হয়? কিংবা স্টেশনের বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানদের খাবারে মিশিয়ে দেওয়া যায় মারাত্মক কোন জীবাণু বা বিষ।

সবচেয়ে ভাল আইডিয়াটা সবশেষে খেলল মাথায়। স্পেস স্টেশনে আসা-যাওয়ার জন্য যে খেয়াযানটা নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে, সময়সূচি জেনে নিয়ে সেই জুবিলিতে টাইমার সহ প্রচুর বিস্ফোরক ফিট করতে হবে। স্পেস স্টেশনে পৌঁছেই—বুম! প্রচণ্ড

বিস্ফোরণে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে আয়না সহ ইজরায়েলিদের স্পেস স্টেশন অ্যাবি।

রানার চোখ দুটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল বারাইদি, হঠাৎ খুক খুক করে হেসে উঠে বলল, 'জানি কী ভাবছ তুমি।'

রানা কিছু বলল না।

'ভাবছ,' আবার বলল বারাইদি, 'খেয়াযান জুবিলি অচল করে দেবে। রাইট?'

'যদি সম্ভব হয়,' বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি ওখানে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। কীভাবে পৌঁছাবে সেটা অবশ্য তোমার ব্যাপার। তবে দেরি করলে জুবিলি আবার না রওনা হয়ে যায়!'

এদিকে দুইসারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে রাস্তা। চট্ করে একবার রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। 'সামনে খাদ। ড্রাইভিং সিটে আমাদের একজনকে বসতে হবে।'

যুক্তিটা বুঝল রানা। ইজরায়েলি ড্রাইভার মরতে ভয় না পেলে আরোহীসহ জিপ নিয়ে নীচের খাদে পড়তে ইতস্তত করবে না।

'এই, জিপ থামাও,' ড্রাইভারকে বলল রানা।

ধীরে ধীরে থামল জিপ। ড্রাইভারের উপর চোখ রেখে নীচে নামল সুরাইয়া।

'আমি পেচ্ছাব করব,' আরবীতে বলল বারাইদি।

'আমিও,' বলল লেফটেন্যান্ট।

জিপ থেকে নেমে ইঙ্গিতে রাস্তার ওপারটা দেখাল রানা বারাইদি আর ড্রাইভারকে। 'পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ সারো। আমরা ঠিক পিছনেই থাকব।'

জিপ থেকে নেমে রাস্তা পেরুল বারাইদি আর ড্রাইভার। এক জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের চেইন খুলতে যাবে, পিছন থেকে ড্রাইভারকে বাধা দিল সুরাইয়া।

'এত কাছাকাছি দাঁড়িয়েছ কেন?' কর্কশ গলায় বলল সে।

'আরও পাঁচ-সাত হাত সরে দাঁড়াও।'

কাঁধের উপর দিয়ে সুরাইয়াকে একবার দেখল লেফটেন্যান্ট। বারাইদির কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে সরে দাঁড়াল সে, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে।

প্রথমে সে-ই শেষ করল। চেইন টেনে তুলতে যাচ্ছে, এই সময় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তার খুলিটা উড়িয়ে দিল সুরাইয়া।

গুলির শব্দ পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

আট

'হোয়াট দা হেল!' রানা হতচকিত, ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে সুরাইয়ার দিকে তাকাল।

সটান পড়ে গেল লেফটেন্যান্টের লাশ। সেটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল সুরাইয়া। 'লোকটা আমাকে চিনে ফেলেছিল, মেশিন-টুলস্ ফ্যাক্টরির গেটে ডিউটি দেয়ার সময় দেখে থাকবে।' ড্রাইভারের হাত দুটো ধরে টানছে সে। ঘন একটা ঝোপের ভিতর লাশটা লুকিয়ে রাখবে।

রানা কিছু বলতে যাবে, চোখের কোণে ক্ষিপ্র বেগে কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখল। এই মুহূর্তে সরাসরি বারাইদির দিকে তাকিয়ে নেই বটে, তবে হাতের পিস্তল তার দিকেই তাক করা।

জানে কী ঘটতে যাচ্ছে, কাজেই ট্রিগার টেনে দিল রানা।

একটা ঝাঁকি খেল বারাইদি, ছুটে পালাবার গতি আরও দ্রুত হলো–তবে তা মুহূর্তের জন্য মাত্র–তারপরই দড়াম করে আছাড়

খেল মাটিতে।

ঢিল পড়ল রানার পেশীতে।

আর ঠিক তখনই ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত একটা লাফ দিয়ে আবার ছুটল বারাইদি। ওদের আর জিপটার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সে, ফিরে যাচ্ছে তুফার দিকে।

বারাইদিকে নিয়ে কী করা হবে, এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি রানা। তবে আশা করছিল তার সাহায্য নিয়ে নাজাফি স্পেস সেন্টারে ঢোকা সহজ হবে।

সে আশায় এখন গুড়ে বালি। জরুরি অবস্থা, কাজেই সিদ্ধান্তটা হঠাৎ করেই নিতে হচ্ছে। বারাইদিকে রানা তুফায় ফিরে যেতে দিতে পারে না। তুফায় পৌঁছাতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নাজাফি স্পেস সেন্টারের সিকিউরিটিকে টেলিফোনে সাবধান করে দেবে সে, ফলে ওর জন্য ভিতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পকেট থেকে রিমোটটা বের করল রানা। বারাইদি প্রাণপণে ছুটছে, তবে ওর সঙ্গে তার দুরত্ব বিশ গজের বেশি হবে না।

রানার গুলি পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। বারাইদির কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ওটা আদৌ তার কোন মাংস নিতে পেরেছে কিনা বলা কঠিন, তবে শার্টের কলার অনেকটাই নিয়ে গেছে।

রিমোট ধরা হাতটা লম্বা করল রানা। তারপর লাল বোতামটায় চাপ দিল। পর পর তিনবার।

অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো ছুটন্ত মোসাদ এজেন্ট, তবে তা শুধু রানার কল্পনায়। এবরান বারাইদি যেমন ছুটছিল, এখনও তেমনি ছুটছে।

যে-কোন কারণেই হোক, রিমোট কাজ করেনি। বারবার বোতামে চাপ দিল রানা। কিন্তু বৃথা। ইতিমধ্যে অনেকটা দূরে চলে গেছে বারাইদি, পিস্তলের গুলিও লাগবে বলে মনে হয় না।

ঘুরে জিপের দিকে ছুটল রানা, দেখল ড্রাইভিং সিটে বসতে যাচ্ছে সুরাইয়া। তার উপর রেগে আছে ও, তবে সেটা পরে ঝাড়া

যাবে। 'জিপ ঘোরাও!' লাফ দিয়ে জিপের পিছনে উঠল ও, চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে। 'ফলো হিম!'

জিপ ছাড়ল না সুরাইয়া। 'শোনো, রানা। আমার একটা প্ল্যান আছে। সেটা ধরে এগোতে চাইলে এখানে আর একটা মিনিটও নষ্ট করা চলে না।'

'তোমার প্ল্যান নিয়ে পরে কথা হবে,' বলল রানা। 'তুমি জিপ ঘোরাও। আগে বারাইদির ব্যবস্থা ... '

'এই জিপ খাদে ফেলে দিয়ে পায়ে হেঁটে দুটো পাহাড় টপকাতে হবে, রানা,' বাধা দিয়ে বলল সুরাইয়া, হাতঘড়ির উপর চোখ। 'বেদুইন গাইড আমাদের জন্য ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে যদি পৌঁছাতে না পারি, ওরা ফিরে যাবে।'

'বেদুইন গাইড আমাদের কেন দরকার?'

'দরকার এই জন্যে যে পরশু রাতে ওদের সর্দার বাহাউদ্দিন চাচা আমাকে বলেছেন, তাঁর আব্বা পাহাড়ের একটা শিরদাঁড়া চেনেন, যেটার ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিল বইছে–আসলে টানেলের ভিতর একটা ঝরণা ছুটছে, গোপন একটা পথ আর কী। আজ দেখা হলে ওই পথের সমস্ত তথ্য জানতে পারব আমরা।'

রানা ইতস্তত করছে।

'তুমি বললে আমি জিপ ছাড়তে পারি,' তাগাদা দিল সুরাইয়া। 'এখন যদি কোন গাড়ি আসে, বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তোমার প্ল্যান যদি স্পেস সেন্টারের ভিতরে পৌঁছে দিতে পারে আমাকে, মন্দ কী।'

'তোমাকে নয়, আমাদেরকে,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সুরাইয়া। 'ওদের স্পেস সেন্টারে আমিও ঢুকব।'

জিপ ছেড়ে দিল সে। স্পীড দ্রুত বাড়াচ্ছে।

'কেন, আমার মিশনের বারোটা বাজাবার জন্যে?'

ঝট করে রানার দিকে একবার তাকাল সুরাইয়া। 'তোমার এ-কথার মানে?'

'আমার অনুমতি না নিয়ে, একটু আভাস পর্যন্ত না দিয়ে, ড্রাইভারকে তুমি কোন বুদ্ধিতে গুলি করলে? সঙ্গে এ রকম চমকে দেয়ার লোক থাকলে মিশন কেঁচে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

একদম বোবা হয়ে বসে থাকল সুরাইয়া।

একটু পর রানা বলল, 'আমাকে আবার অকৃতজ্ঞ ভেবো না। এই যে এত দূর আসতে পেরেছি, সে তো তোমার সাহায্য নিয়েই। কিন্তু তারপরও তোমাকে মনে না করিয়ে দিয়ে পারছি না—ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে আমরা দু'জনই মারা যেতে পারি। তারচেয়ে বড় ক্ষতি, অর্থাৎ মিশনটাও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' অবশেষে মুখ খুলল সুরাইয়া। 'কথা দিচ্ছি, এরকম ভুল আর হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

আরও দশ মিনিট গাড়ি চালাবার পর একপাশে তিনশো ফুট গভীর খাদ দেখা গল, আরেক পাশে পাথুরে পাহাড়ের ঢাল। জিপ থামিয়ে নেমে পড়ল ওরা।

রাস্তাটা খাদের দিকেই ঢালু, তাই সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই জিপের চাকা গড়াতে শুরু করল। পতনটা দেখবার জন্য কিনারায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকতে হলো ওদেরকে।

নীচের নদী মন্থর গতিতে বইছে, গভীরতা খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না। তবে জিপটা ওদের পছন্দসই ভঙ্গিতে স্থির হলো। খাদের নীচের দিকের ঢালে তিনটে ডিগবাজি খেল ওটা, তারপর একটা লাফ দিয়ে পৌঁছে গেল নদীর প্রায় মাঝখানে। চারচাকা আকাশের দিকে তুলে স্থির হলো জিপ, পানির উপর ওই চাকাগুলো ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

খাদের নীচে জিপ স্থির হতেই রানাকে পথ দেখাল সুরাইয়া।

ওদের ভাগ্যই বলতে হবে যে তুফা বা নাজাফির দিক থেকে এখন পর্যন্ত কোন গাড়ি আসেনি। পাহাড়ের ঢালে প্রচুর বোল্ডার পড়ে আছে, আড়াল নিয়ে চূড়ায় উঠে এল ওরা।

সঙ্গে ম্যাপ আছে, মাঝে মধ্যে সেটার ভাঁজ খুলে দেখে নিল সুরাইয়া। প্রথম পাহাড়টা টপকাতে সময় লাগল এক ঘণ্টা।

দ্বিতীয়টা ছোট পাহাড়, ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পেরুনো গেল। একটা গুহার ভিতর অপেক্ষা করছিল ওদের গাইড, দু'জন সঙ্গী আর চারটে ঘোড়া নিয়ে।

তিনজনই তারা বেদুইন তরুণ। ঘোড়া পালা, ট্রেনিং দেওয়া আর বেচা-কেনা করা তাদের পেশা। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক খুব ভাল, তাই প্রয়োজনে যখনই কোন সাহায্য চাওয়া হয়, বিমুখ হতে হয় না।

নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই হামাসের কাছ থেকে গেরিলা যুদ্ধের কিছু ট্রেনিং নিয়েছে তারা। প্রায় সবাই রাইফেল চালাতে জানে।

ওদের সর্দার বাহাউদ্দিন গাইডকে কিছু নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছে। তাই প্রথমেই সে তুফার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইল।

কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল সুরাইয়া। সে থামতে গাইড বলল, 'তারমানে আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে কপ্টার পাঠাবে ওরা।' তার ইঙ্গিতে এক লোক একটা ব্যাগ নিয়ে এল গুহার ভিতর দিক থেকে। 'এটায় ঢোলা আলখেল্লা আর নকল দাড়ি-গোঁফ আছে,' রানাকে বলল সে। 'পরে নিন।' সুরাইয়ার দিকে ফিরল। 'আপনাকে ছেলে সাজতে হবে, ম্যাডাম। তবে চুল কাটার দরকার নেই, পাগড়ির মত করে মাথায় একটা লম্বা কাপড় জড়িয়ে নিন। ইউনিফর্মগুলো বালির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।'

'এত ঝামেলা না করলেই কি নয়?' বলল সুরাইয়া। 'আর

এক ঘণ্টা পরেই তো সন্ধে হয়ে যাবে।'

'সন্ধে হতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, ম্যাডাম,' বলল বেদুইন গাইড। 'আমরা রওনা হবার পর হঠাৎ যদি মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টার গানশিপ চলে আসে, তখন কিন্তু এই সাবধানতাকে ঝামেলা বলে মনে হবে না।'

মনে মনে তাকে সমর্থন করল রানা। ও জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা? সেখানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'আমরা যাচ্ছি হার বারমন পাহাড়ের কাছাকাছি,' বলল গাইড। 'ওখানে আপনাদের জন্যে আমাদের সর্দার অপেক্ষা করছেন। রাস্তা নয়, পাহাড়ী এলাকার ওপর দিয়ে যাব, তা-ও অনেক ঘুরে, তাই পৌঁছাতে সকাল হয়ে যাবে...'

'সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে?'

'ঘোড়া ছুটবে আর কতক্ষণ।' হাসল গাইড। 'পথ বলতে তো বেশির ভাগই খাদের মাথায় সরু কারনিস।'

'কিন্তু সুরাইয়ার বিশ্রাম দরকার, অন্তত দু'তিন ঘণ্টা হলেও,' বলল রানা।

'না-না, বিশ্রাম না নিলেও চলবে আমার,' তাড়াতাড়ি বলল সুরাইয়া। 'তবে খিদে পেয়েছে—দুপুরে আমরা কিছু খাইনি।'

বিব্রত হলো গাইড। 'ছি-ছি, আগে বলবেন তো! এই, খাবার কী আছে নিয়ে এসো।'

প্রচুর খোরমা, পনির, পাঁপরের মত দেখতে শুকনো রুটি, মধু আর সবশেষে কড়া এক কাপ করে কফি খেয়ে রওনা হলো ওরা।

গাইডের সঙ্গীরা স্কাউট হিসাবে একটা ঘোড়ার পিঠে সামনে থাকল। তারপর থাকল দুটো আলাদা ঘোড়ায় রানা আর সুরাইয়া। গাইড কখনও ওদের পিছনে থাকল, আবার কখনও সামনে।

রওনা হবার আধঘণ্টা পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনল ওরা। অনেকক্ষণ ধরে শোনা গেল, কখনও কম কখনও বেশি।

অর্থাৎ একটা প্যাটার্ন ধরে সার্চ করছে ইজরায়েলিরা। নিশ্চয়ই ওদের দু'জনের খোঁজে।

এবরান বারাইদি তা হলে তুফায় পৌঁছেছে। তার কাছ থেকে খবর না পেলে এত তাড়াতাড়ি এদিকে ওরা খুঁজতে আসত না।

কপ্টারের আওয়াজ এক সময় মিলিয়ে গেল।

একটানা পাঁচ ঘণ্টা ঘোড়ার পিঠে থাকবার পর রাত ন'টায় বিশ্রামের জন্য থামল ওরা।

রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা, রানা আর সুরাইয়ার খোঁজে এই ছয় ঘণ্টা দুই ঝাঁকে অন্তত ছয়টা হেলিকপ্টার গানশিপ পালা করে গোটা পাহাড়ী এলাকায় কম্বিং, অর্থাৎ চিরুনি অভিযান চালাল।

এমন নকশা ধরে সার্চ করছে, এক ইঞ্চি জমিনও যাতে চোখ ধাঁধানো স্পট লাইটের বাইরে থেকে না যায়।

গাইড ওদেরকে নিয়ে রওনাও হয়েছে ওই এগারোটার সময়। তবে ওদের সুবিধে হলো, কপ্টার আসার আগে আওয়াজ চলে আসে, দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায় আলোটাও। সাবধান হওয়ার অর্থাৎ গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

খাদের মাথার দিকে ঝুলে থাকা কারনিস ধরে এগোচ্ছে ওরা, খাদ খুব চওড়া না হওয়ায় পাইলটরা কপ্টার নিয়ে নীচে নামতে পারছে না। স্পট লাইট ঘুরিয়ে কারনিসে তাক করতে যে সময় লাগছে, তার আগেই একটা বাঁক ঘুরবার বা কোন গুহায় লুকাবার সময় পাওয়া যাচ্ছে।

তল্লাশি চালাবার ধরন দেখে গাইড আর সুরাইয়া খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। দিনের আলোয় এই অভিযান যে আরও বহুগুণ জোরদার করা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওদের মত রানাও চিন্তিত, তবে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষ একটা তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছে ও। যেভাবে আদাজল খেয়ে

ওদেরকে খুঁজছে ইজরায়েলিরা, এর একটাই অর্থ হতে পারে–রানাকে তারা নাজাফি স্পেস সেন্টারের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিতে চাইছে না।

কেন?

স্পেস সেন্টারে হয়তো এমন কিছু আছে বা এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে, রানার পক্ষে তা নষ্ট বা ভণ্ডুল করে দেওয়া সম্ভব।

রানা ভাবছে, বারাইদি বোধহয় কথাটা গর্ব করবার জন্য বলেনি, খেয়াযান জুবিলি হয়তো সত্যি সত্যিই স্পেস স্টেশন অ্যাবির উদ্দেশে রওনা হতে যাচ্ছে।

হয়তো রিফুয়েলিঙের জন্যই দিনের আলোয় চারদিক ফরসা হবার ঠিক আগে কপ্টারের ঝাঁকগুলো পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে ফিরে গেল। উপত্যকায় নেমে এসে মরুভূমির ফাঁকা পথ ধরল ঘোড়সওয়াররাও।

আধ ঘণ্টা পরই বোঝা গেল এলাকাটার উপর এত কেন কড়া নজর রাখছে ইজরায়েলি সৈন্যরা।

নাজাফিতে পৌঁছে গেছে ওরা।

দুই পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে এগিয়ে একটা ঢাল আর গুহা পেরোবার পর স্পেস স্টেশনটা দেখতে পেল। তবে তারও আগে সাক্ষাৎ ঘটল বেদুইনদের মূল দলের সঙ্গে। সর্দার বাহাউদ্দিনের লোকেরা ওদেরকে স্বাগত জানাল।

পরবর্তী পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মিনিট দশেক উঠবার পর একটা কারনিস পড়ল সামনে। উল্টোদিকে কয়েকটা গুহা রয়েছে। বড়সড় একটা গুহায় দশ-বারোটা ঘোড়াকে দেখা গেল, বেদুইনরা পাহারা দিচ্ছে। কিছু লোক এক জায়গায় জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল আলখেল্লা পরা দীর্ঘদেহী এক লোক, বয়স হবে পঞ্চাশের আশপাশে।

'উম্মে সুরাইয়া, আমার বেটি!' সুরাইয়াকে দেখে উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠল লোকটা। তারপর তার চোখ পড়ল রানার দিকে। ‘পরদেশী, মেহমান, আস্‌সালামো আলায়কুম।’

সালামের জবাব দিল রানা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ঘোড়া থেকে নামছে।

‘সর্দার চাচা, ইনি মাসুদ রানা,’ ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বলল সুরাইয়া। ‘রানা–সর্দার বাহাউদ্দিন।’

‘আল্লাহ মেহেরবান, আপনারা বহাল তবিয়তে পৌঁছাতে পেরেছেন। কাল সারারাত আকাশে যেভাবে টহল দিচ্ছিল ওরা...’

‘জী, চাচা, আমরাও খুব ভয় পেয়েছিলাম,’ বলল সুরাইয়া। ‘তবে আল্লাহ সত্যিই মেহেরবান।’

আবার রানার দিকে ফিরল সর্দার। ‘আমাদের বড়ই খুশনসিব যে বিদেশী হয়েও জালেম ইহুদিদের শায়েস্তা করতে এসেছেন আপনি, আপনার মঙ্গল কামনা করি।’

‘চাচা, এদিকের খবর কী?’ জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া, হঠাৎ সিরিয়াস প্রসঙ্গে চলে গেল সে।

‘আব্বার বয়স হয়েছে। কথাটা বলেওছিলেন বিশ-পঁচিশ বছর আগে, তখন নাজাফি স্পেস সেন্টার তৈরি হয়নি। প্রসঙ্গটা তুলতে দেখা গেল সব বেমালুম ভুলে গেছেন।’

‘কী বলছেন, চাচা!’ চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুরাইয়ার। ‘এখন তা হলে কাঁটাতারের বেড়া টপকাতে হবে?’

‘ওই বেড়া টপকানো অসম্ভব,’ বলল সর্দার। ‘পনেরো ফুট উঁচুই শুধু নয়, ইলেকট্রিফাইডও। বেড়া টপকাতে পারলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, মাটিতে আর পাথরে লুকানো আছে শয়ে শয়ে খুদে সেনসর। একটু ধাক্কা লাগলেই সেন্টারের রেইডার ডিসপ্লেতে লাল আলো জ্বলে উঠবে। আর আলো জ্বললেই সশস্ত্র সৈন্যরা ছুটে আসবে জিপ নিয়ে।’

‘তা হলে?’

‘এত ঘাবড়াচ্ছ কেন, বেটি,’ আশ্বাস দিয়ে একটু হাসল সর্দার

বাহাউদ্দিন। 'ব্যবস্থা একটা হতেই হবে। আব্বা ভুলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তো তাঁর বলা কথাগুলো ভুলিনি।'

'পাহাড়ের একটা শিরদাঁড়া,' সর্দার থামতেই বলে গেল রানা, মুখস্থ করে রেখেছে, 'ভেতরে অন্তঃসলিলা বইছে। আসলে টানেলের ভেতর একটা ঝরণা। গোপন একটা পথ।

'পাথুরে শিরদাঁড়া আর ঝরণা কোথায় আছে, এটা জানা কোন ব্যাপারই নয়, বিশেষ করে এদিকে যাদের আসা-যাওয়া আছে।'

'শাবাশ! শাবাশ, পরদেশী!' প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সর্দার। 'এদিকে সত্যি আমার আসা-যাওয়া আছে, কাজেই পাহাড়ের শিরদাঁড়া আর ঝরণা আমি চিনি। কাল কিছুক্ষণ খোঁজার পর মাটির তলার স্রোতটাও পেয়ে গেছি।'

গুহাটা আসলে বিরাট লম্বা একটা টানেল, ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে পাথুরে মেঝে।

একটানা ছয় ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে এলেও, সুরাইয়া অক্লান্ত; বিশ্রাম গ্রহণের সর্দারের প্রস্তাবে রাজি হয়নি, বলেছে আগে ওরা জানতে চায় স্পেস সেন্টারে ঢুকবার গোপন পথ সত্যি আছে কি না। সেটা জানবার জন্যই হাঁটছে এখন ওরা।

মিনিট দশেক পর টানেলের আরেক মুখ দিয়ে বাইরে বেরুনো গেল। পাহাড়ের এটা আরেক দিক। সামনে মরুভূমি। চোখে বিনকিউলার তুলতে ধু-ধু বালির রাজ্যে শুধু কাঁটাতারের বেড়াটা দেখা গেল, তাও অন্তত মাইল খানেক দূরে।

বেড়ার ওপারে একটা পাহাড় আর বালি ছাড়া কিছু নেই।

'ডান দিকে তাকান, পরদেশী,' বলল সর্দার।

সেদিকে তাকিয়ে, বেড়ার বাইরে, একটা পাহাড় দেখতে পেল রানা, সেটাও মাইল দুয়েক দূরে। দেখতে পেল পাথরের শিরদাঁড়াটাও।

শিরদাঁড়া না বলে 'হাইওয়ে' বললেই যেন বেশি মানায়।

আসলে একটা রিজ। রানার মনে হলো, মরুভূমির উপর কেউ যেন ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউটাকে এনে বসিয়ে দিয়েছে–একই রকম চওড়া, কালো আর মসৃণ; পাহাড়ের গা থেকে নেমে তিন মাইল বিস্তৃত, বালির মেঝে থেকে পাঁচ-সাত ফুট উঁচু।

কাঁটাতারের বেড়া এই শিরদাঁড়া বা অকৃত্রিম হাইওয়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। অপর প্রান্তটা স্পেস সেন্টারের ভিতর কাছাকাছি পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে।

'ওই শিরদাঁড়ার নীচে রয়েছে পানির স্রোত,' বলল সর্দার। 'আসলে হিম-শীতল পানি, ওই সারি সারি পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে গেছে পাতালে। খানিক দূর নেমে দু'ভাগ হয়ে গেছে ওটা।'

'একটা শাখা পাহাড়ী ঝরণা হয়ে বেরিয়েছে ডান পাহাড়েরই একটা ঢালে, দ্বিতীয়টা বেরিয়েছে বেড়ার ওপারের পাহাড়টার পাশে–একটা নালার গায়ে।'

সুরাইয়া জিজ্ঞেস করল, 'আমরা দ্বিতীয় শাখা বা টানেল ধরে যাব?'

মাথা ঝাঁকাল সর্দার। 'দ্বিতীয় শাখায় পৌঁছাতে হলে প্রথম শাখায় ঢুকতে হবে। সেটাও চওড়া একটা টানেলের মত।'

'আপনি এই পথ ধরে গেছেন কাল?' জানতে চাইল রানা। 'দ্বিতীয় শাখার শেষ মাথা, নালা পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, গেছি। তবে ভেতরটা বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। ভয়ানক অন্ধকার। কোথাও কোথাও টানেল এত সরু যে নিজেকে মনে হয়েছে বোতলের গলায় আটকে যাওয়া ছিপি।'

'নালা থেকে বেরিয়ে চারপাশে কী দেখলেন?'

'শুধু ওই পাহাড়টা। আর কিছু নেই।'

'আর কিছু নেই মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ভেতরে দালান, রাস্তা কিংবা লঞ্চ ফ্যাসিলিটি দেখেননি?'

মাথা নাড়ল সর্দার বাহাউদ্দিন। 'তখন সন্ধে হয়ে এসেছিল,

চারদিকে চোখ বুলিয়ে বালি ছাড়া কিছু দেখলাম না। দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট, রকেট-ফকেট সবই নিশ্চয় আছে, তবে অনেক দূরে কোথাও।'

রানার দিকে ফিরে সুরাইয়া বলল, 'মনে হচ্ছে টানেল থেকে বেরিয়েও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। আমাদের বোধহয় বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।'

দেরি রানাও করতে চায় না, কারণ খেয়াযান জুবিলি যদি সাপ্লাই নিয়ে রওনা হয়ে যায়, ক্ষতি করবার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু এদিকে একটা সমস্যাও আছে। 'দিনের বেলা মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেরুব? হঠাৎ যদি একটা...'

রানার কথা শেষ হলো না, কাছাকাছি আকাশ থেকে একটা কিছুর ভটভটভটভট আওয়াজ ভেসে এল। কারুরই বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ওটা ভারী একটা হেলিকপ্টার; নিশ্চয়ই রকেট লঞ্চার আর মেশিন গান সজ্জিত।

সাবধানতার মার নেই, দ্রুত পিছিয়ে গুহার আরও ভিতর দিকে সরে এল ওরা।

তবে একটু পরেই মিলিয়ে গেল কপ্টারের আওয়াজ।

'এই পরিস্থিতিতে দিনের বেলা ফাঁকা জায়গায় বেরুনো আর আত্মহত্যা করা, একই কথা,' বলল সর্দার। 'তারচেয়ে খেয়েদেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিলে, আখেরে সেটা কাজে লাগবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো সুরাইয়া।

এক ঘণ্টা পরই উপলব্ধি করল সে, রানা আর সর্দারের কথা মেনে নিয়ে নিজের কত বড় উপকার করেছে।

সকাল ছ'টায় পুরোদমে শুরু হলো ঝাঁকের পর ঝাঁক হেলিকপ্টারের তল্লাশি অভিযান। স্পেস সেন্টারের আশপাশের মরুভূমির প্রতিটি ইঞ্চির উপর চোখ বুলাচ্ছে ইজরায়েলিরা।

বেলা যত বাড়ল, কপ্টারের আসা-যাওয়াও তত বেড়ে গেল। রানা ভয় পেল, আর্মারড্ ভেহিকেল নিয়ে আর্মিও চলে আসতে

পারে পাহাড়ের গুহাগুলো সার্চ করতে।

সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা ডিফেন্স টিম গঠন করা হলো। যদি কোন হেলিকপ্টার নামে বা ট্রুপস ক্যারিয়ারে চড়ে সৈন্যরা চলে আসে, কাকে কী করতে হবে সব ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো বেদুইন তরুণদের।

বিকেল চারটে। আকস্মিক বালু ঝড়ে ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। কপ্টারের ঝাঁক ফিরে গেল ঘাঁটিতে।

ইতিমধ্যে পাঁচ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরেছে রানা আর সুরাইয়া। নিশ্ছিদ্র, মোটা পলিথিন দিয়ে তৈরি দুটো ব্যাগ দেওয়া হয়েছে ওদের—স্রোত ধরে এগোবার সময় ওগুলোয় অস্ত্র, বিস্ফোরক, কাগজ-পত্র আর কাপড়-চোপড় রাখবে।

ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। কারণ জানে ঝড় থামবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে কপ্টারগুলো। ওদের প্রতিবাদ কানে না তুলে পথ দেখাবার জন্য সঙ্গে আসছে সর্দার। ঝরণার মুখ পর্যন্ত ওদেরকে পৌঁছে দেবে সে।

দুই দফায় সব মিলিয়ে চার কি সাড়ে চার মাইল হাঁটতে হলো ওদেরকে। প্রথম বার ডানদিকের পাহাড়টার ঢালে পৌঁছে থামল। টানেলের মুখ এখানে একটা ছাতা আকৃতির ঝুল-পাথরের নীচে।

মুখটা মোটেও বড় নয়, হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় ছাদের ঘষা লাগল পিঠে। ওদেরকে এগোতে হলো স্রোতের উল্টোদিকে।

বেদুইন সর্দার বাহাউদ্দিনের কাছে ঋণী হয়ে থাকল ওরা। ওদের লাগবে ভেবে টিনের হেলমেট থেকে শুরু করে টর্চ পর্যন্ত কত কী-ই না যোগাড় করে রেখেছিল সে।

দ্বিতীয় শাখাটা ছোট, পৌঁছাতে মাত্র বিশ মিনিট লাগল ওদের। এরপর পানির স্রোত ওদের অনুকূলে, ফলে এগোবার জন্য জোর খাটাতে হচ্ছে না।

মাঝখানে দু'বার বিশ্রাম নিতে হলো ওদেরকে। আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল, কাজেই অক্সিজেনের অভাব হতে বাধ্য। বিশেষ পরিশ্রম করেনি, অথচ হাঁপাচ্ছে।

অবশেষে একটা চওড়া ফাটলের ভিতর থেকে নালার গায়ে বেরিয়ে এল ওরা।

ঝড় থেমে গেছে। সময়টা গোধূলি। নালার ভিতর থেকে আকাশ যতটুকু দেখা যায়—খালি। ইঞ্জিনের কোন আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে না রানা।

এই মুহূর্তে দুজনেই খুব ব্যস্ত। ব্যাগ থেকে যে-যার পোশাক বের করে পরে নিচ্ছে। দেখে নিচ্ছে যে পকেটে যেটা যাবার কথা সেটা ঠিক সেখানেই গেছে কিনা।

তারপর উঁকি দিয়ে নালার উপর কী আছে দেখল রানা।

আশপাশে সত্যি কিছু নেই। তবে সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসায় স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করতে দেখা গেল একটা রকেটকে—বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মহাশূন্যে রওনা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। কাছাকাছি কোথাও নয়, কম করেও ছয় মাইল দূরে সেটা।

এই রকেটের কথাই বোধহয় বলেছিল বারাইদি; সাপ্লাই নিয়ে স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে যাবে।

সময় মত ওখানে পৌঁছে ওটার রওনা হওয়া রানা হয়তো ঠেকাতে পারবে না, তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, অ্যাবির অ্যাস্ট্রনটরা এরপর আর যাতে কোন সাপ্লাই না পায় সেটা নিশ্চিত করেই ইজরায়েল ত্যাগ করবে ও।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যে-কোন মূল্যে।

এই মাত্র সন্ধ্যে নামছে। সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ রাত। সুরাইয়াকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা।

মাইল খানেক পার হয়েছে ওরা, কপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল পিছন থেকে। ইতিমধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে চারদিক।

কপ্টার নয়, ওটার স্পটলাইটের আলো দেখতে পেল ওরা–কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে, প্রায় তিন মাইল পিছনে, ওদের ফেলে আসা পাহাড়ের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বেদুইনরা ওখানে এখন নেই। সর্দার বাহাউদ্দিন ওদেরকে বলে গেছে, বালুঝড়ের মধ্যেই তার লোকজন ঘোড়া নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হবে। ও দিকের ছোট এক শহরে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে সে।

আবার ছুটতে শুরু করল ওরা।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, ওদের সামনে দিয়ে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটা বৃত্তাকার, স্পেস সেন্টারের লঞ্চ ফ্যাসিলিটিকে চার মাইল দূর থেকে ঘিরে রেখেছে। আর্মারড্ ভেহিকেল নিয়ে সারাক্ষণ টহল দিচ্ছে সৈন্যরা।

টহল পার্টি না বলে কনভয় বললেই বেশি মানায়। সামনে পিছনে একটা করে আর্মারড্ ট্রুপস ক্যারিয়ার রয়েছে, মাঝখানে দুটো ট্যাঙ্ক, তিনটে খোলা জিপ, একজোড়া মেশিন গান আর রকেট লঞ্চার নিয়ে দুটো কার্গো ক্যারিয়ার।

ট্যাঙ্কগুলোর কারণেই টহল পার্টির গতি মন্থর। বালিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ইজরায়েলি সিকিউরিটি ফোর্স-এর চলে যাওয়া দেখল ওরা।

তারপর আবার দৌড়।

সুরাইয়া রানার চেয়ে কম যায় না, সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মেয়েটা যেন ক্লান্ত হতে জানে না, প্রয়োজনে সারা রাত ছুটতে পারবে।

‘এবার আমার বিশ্রাম না নিলেই নয়!’ অসম্ভব হাঁপাচ্ছে সুরাইয়া, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেল শরীর, দুই হাত দুই হাঁটুর উপর। ‘তোমার কাছে সুপারম্যানও কিছু না। একটা মানুষ এত কী করে দৌড়ায়? আমি কখনও এ রকম দেখিনি।’

‘শরীরটাকে ফিট রেখেছি, ব্যস, এর মধ্যে অন্য কোন জাদু নেই,’ বলল রানা। কম ক্লান্ত নয় ও, তবে সুরাইয়ার মত শেষ সীমায় পৌঁছে যায়নি। আরেকবার কথাটা ভাবল, সুরাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্পেস সেন্টারে ঢোকাটা বোকামি হয়ে যায়নি তো?

দালান-কোঠার ছোট একটা ঝাঁকের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। এখানে ওরা সাময়িক আশ্রয় বা আড়াল নিয়েছে।

বড় একটা একচালার ভিতর কম্বল, ফার্নিচার ইত্যাদি পাওয়া গেল। পাশেরটা খাবারদাবার। বোঝাই যায়, এ-সব গ্রাউন্ড ক্রুদের জন্য। বাকি একচালা বা দু'চালায় ঢুকে সময় নষ্ট করল না রানা, জানে ওগুলোয় কী ধরনের জিনিস থাকতে পারে।

ও যা খুঁজছে, সেটা আর সব জিনিসের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকবে, যাতে আগুন লাগলে বা বিস্ফোরণ ঘটলে ক্ষতির পরিমাণ সীমিত পর্যায়ে থাকে।

কেমিক্যাল স্টোরেজ ডিপো।

‘ওদিকে,’ বলল রানা, হাত তুলে বেশ কয়েক গজ দূরের সামান্য আলোকিত একটা ভবন দেখাল সুরাইয়াকে। ‘আমরা কি ওটাই খুঁজছি?’

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুরাইয়া, দালানটার মাথায় হিব্রু ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডটা পড়বার চেষ্টা করল। ‘সতর্ক করা হয়েছে। শুধু “বিপজ্জনক” লেখাটা পড়া যাচ্ছে। বাকিটা অস্পষ্ট, পড়তে পারছি না।’

‘ওতেই হবে। চলো।’

এক ছায়া থেকে আরেক ছায়ায় ছুটছে রানা; একদল পদাতিক সৈন্য টহল দিতে আসছে দেখে স্যাৎ করে সরে এসে লুকিয়ে পড়ল কয়েকটা ড্রামের পিছনে।

পনেরো ফুট দূর থেকে পাশ কাটাল টহল পার্টি, ওর উপস্থিতি টের পায়নি। বুট জুতোর আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল।

সুরাইয়াকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, তল্লাশির কাজে ব্যস্ত

রানা। একটা ভবনে বিপজ্জনক শব্দটা লেখা থাকলে ধরে নিতে হবে ভিতরে নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু আছে।

এই তালাটা বাকিগুলোর মত সহজে খোলা গেল না। কাছাকাছি কোন টহলদারি নেই, কাজেই সময় নিয়ে চেষ্টা করছে রানা।

শার্টের সিম থেকে সরু একটা ইস্পাতের পিকলক বের করল ও, লক টাম্বলারগুলোয় ঢোকাল স্টিলের পাতলা স্প্রিঙ স্লিভারটা, তারপর এক এক করে ওগুলোকে স্থানচ্যুত করবার কষ্টসাধ্য কাজ শুরু করল। সবগুলোকে জায়গামত সরিয়ে আনবার পর পিকটাকে ঘোরাল, হুক আকৃতির শেষ প্রান্তটাকে ব্যবহার করল মোচড়ানোর ভঙ্গিতে। ভারী প্যাডলক খুলে গেল।

'পাকা চোর অতিশয়,' আরবীতে ফিসফিস করল সুরাইয়া।

রানার মুচকি হাসি অন্ধকারে দেখা গেল না। কবাট খুলে নিঃশব্দে দালানটার ভিতর ঢুকে পড়ল ও।

বড় একটা কামরায় ঢুকেছে ওরা। সম্পূর্ণ খালি।

'এক্সপ্লোসিভ কেমিক্যালস,' পড়ল সুরাইয়া, একটা দরজার কবাটে লাল হরফে লেখা রয়েছে। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে একটা কটু গন্ধ ভেসে আসছে।

এই তালাটা সহজেই খোলা গেল। কামরার ভিতর, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত, কার্ডবোর্ড ক্যানিস্টার সাজানো। ভিতরে কাঁচের বড় বড় জার-এ রাখা হয়েছে তরল বিস্ফোরক। এই বিস্ফোরকের শক্তি জেলিগনাইটের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। একটা জার ফাটাবার ব্যবস্থা করা গেলে বাকিগুলো সিমপ্যাথেটিক রিয়্যাকশনে ফাটবে।

রানার কাছে টাইমার আর ডেটোনেটিং মেকানিজম সহ জেলিগনাইটের স্টিক আছে বেশ কয়েকটা। কাজ শুরু করবার আগে সুরাইয়াকে বলল, 'এগুলো আরও অনেক জায়গায় ফিট করব, বিশেষ করে যেখানে ফুয়েল আছে। আমি চাই চারদিকটা

ঘুরে কোথায় কী হচ্ছে দেখে এসো তুমি। কে কী বলে কান পেতে শুনবে। তবে সাবধান, কিছু করতে যেয়ো না। ধরাও পোড়ো না, ঠিক আছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'এত সাবধান না করলেও পারো,' বলল সে। 'আমি অনভিজ্ঞ বা বোকা নই।'

'আমি আশপাশেই কোথাও থাকব। তুমি ফিরবে এক ঘণ্টা পর।'

'আর আমি যদি না ফিরি, আমাকে ছাড়াই বেরিয়ে যাবে তুমি। গুডবাই, রানা।'

রানাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সুরাইয়া।

নয়

এক্সপ্লোসিভ কেমিক্যাল ভর্তি কামরায় একটা জেলিগনাইট স্টিক ফিট করে দালানটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে স্কাইলাইন-এর উপর চোখ বুলাচ্ছে, মনে আশা, ফুটন্ত তরল অক্সিজেনের অস্তিত্ব ফাঁস করে দেয় এমন ক্ষীণ ধোঁয়া দেখতে পাবে।

ঠাণ্ডা রাতে রুপালি মরীচিকার মত ধরা পড়ল ওগুলো।

দ্রুত সেদিকে এগোল রানা। কাছাকাছি এসে দেখল এটা একটা কমপ্রেসার প্লান্ট। নাসার স্পেস স্টেশনে এরকম প্লান্ট আগেও রানার দেখা আছে। সেটার সঙ্গে এটার মিল সহজেই চোখে পড়ল। সম্ভবত একই ডিজাইন থেকে তৈরি।

ক্যাটওয়াকে উঠে এল রানা। কিছুক্ষণ নড়াচড়া না করে নিশ্চিত হয়ে নিল, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তারপর ধীরে ধীরে এগোল। ওর গন্তব্য দৈত্যাকার কমপ্রেসার-এর নীচের একটা জায়গা।

কমপ্রেসারটা অ্যাটমসফিয়ার থেকে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন শুষছে, গ্যাসগুলোকে ঘন করছে তরল পর্যায় পর্যন্ত, তারপর পাইপের সাহায্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিচু তাপমাত্রার স্টোরেজ ট্যাংকে।

জেলিগনাইটের স্টিক ফিট করবার জন্য তরল অক্সিজেন পাইপ বেছে নিল রানা। গোটা প্লান্টের আরও তিন জায়গায় এরকম বিস্ফোরক বসাল।

সবশেষ টাইমারের কাঁটা অ্যাডজাস্ট করল। প্রতিটি বিস্ফোরণ এখন থেকে এক ঘণ্টা পর ঘটবে।

কমপ্রেসার প্লান্ট থেকে সরে এল রানা। খানিকটা হাঁটবার পর গ্যাসলিন ভর্তি একটা ট্যাংকার দেখতে পেল, রকেট ইঞ্জিন অ্যাসেম্বলি এলাকার কাছাকাছি। এই ট্যাংকারে-ও বিস্ফোরকের একটা টুকরো ফিট করল।

এখন দরকার ভাগ্যের সহায়তা। আশা করা যায় বিস্ফোরণগুলো ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়মতই ঘটবে। আগুনও দ্রুত সব কিছু গ্রাস করে নেবে। স্পেস স্টেশনে সাপ্লাই পাঠাবার জন্য ক্যাপসুল আর রকেট তৈরি করে রাখা হয়েছে, তবে আগুনের সেই গ্রাস থেকে ওগুলো বাঁচবে না।

বারাইদির দেওয়া তথ্য অনুসারে স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে সাপ্লাই পাঠানো হয় প্রতি চারমাসে একবার। অর্থাৎ পরবর্তী চারমাস না খেয়ে থাকতে হবে ইজরায়েলি অ্যাস্ট্রনটদের। শুধু খাবার নয়, অক্সিজেন আর পানিও পাবে না তারা।

আতসী কাঁচ দিয়ে তৈরি অস্ত্রটাকে অপারেট কববার জন্য অভিজ্ঞ লোক দরকার। খাদ্য বা অক্সিজেনের অভাবে অ্যাবির

সবাই মারা যাওয়ার পর কী ঘটবে?

পেটের ভিতর বোমা নিয়ে রানার এই প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছে বারাইদি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস-এর পজিশন খানিক পর পর অ্যাডজাস্ট করবার প্রয়োজন হয়। তা না হলে সৌর বাতাস ঘুরিয়ে অন্যদিকে সরিয়ে দেবে ওটার মুখ।

ব্যস, বিপদ কেটে যাবে।

কেমিক্যাল স্টোরেজ এলাকায় ফিরে এল রানা। এসে দেখে ওর জন্য অপেক্ষা করছে সুরাইয়া। ছায়ার ভিতর তার চেহারা আবছা দেখাচ্ছে, তবে থমথমে গম্ভীর ভাবটা ঠিকই রানার চোখে ধরা পড়ল।

'কিছু ঘটেছে,' বলল ও। 'কেউ দেখে ফেলেছে তোমাকে?' দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কল্পনার চোখে আগেই দেখে রেখেছে ও– ছ'মাইল হেঁটে নালার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় বিস্ফোরণ ঘটল, গোটা লঞ্চ ফ্যাসিলিটিতে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। এই পরিস্থিতিতে প্রাণ নিয়ে কেটে পড়া পানির মত সহজ।

কিন্তু বোমা ফাটবার আগেই যদি তল্লাশি শুরু হয়ে যায়, ওরা ভয়ঙ্কর একটা ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে। সুরাইয়াকে যদি সত্যি তারা দেখে ফেলে থাকে, গুরুত্বপূর্ণ স্টোরেজ এরিয়া অবশ্যই সার্চ করবে।

স্টিকগুলো দেখে ফেলবে তারা। টাইমার আর ডেটোনেটর খুলে নিলে একটাও ফাটবে না।

'তোমার প্ল্যান কোন কাজে আসবে না,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সুরাইয়া।

'কেন, ওরা কি এরই মধ্যে জেলিগনাইট দেখে ফেলেছে?'

'না, রানা, তা নয়। মেজর এবরান বারাইদিকে দেখলাম...'

'সে কী! কোথায়? কী করছে?'

'ওটায় চড়ে যারা মহাশূন্যে যাবে,' হাত তুলে লঞ্চ প্যাডের

দিকটা দেখাল সুরাইয়া, ‘তাদেরকে ব্রিফ করছিল।’

‘তার অবস্থা কেমন দেখলে?’ পকেটে হাত ভরে রিমোটটার স্পর্শ নিল রানা। ‘পেটের বোমাটা অপারেশন করে বের করে ফেলেছে কি না...’

‘ও-সব বুঝব কীভাবে!’

‘তা হলে কী বুঝেছ তাই বলো।’

‘তার কথা শুনে বুঝলাম, স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে যারা আছে, আগামী ছ’মাস সাপ্লাই না পেলেও চলবে তাদের। এমনকী এক বছরও চলতে পারবে, যদি এখন থেকেই রেশনিং শুরু করে।’

‘কিন্তু আমি যতটুকু জানি, ছ’মাস চলবার মত অত অক্সিজেন স্পেস স্টেশনে থাকে না,’ এই তথ্য কিছু দিন আগে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জেনেছে রানা।

‘ওরা একটা রিসাইক্লিং সিস্টেম ব্যবহার করছে। ওদেরকে এখন তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে পারো।’

‘রিসাইক্লিঙের মাধ্যমে অক্সিজেন পাচ্ছে?’ রানার কণ্ঠস্বরে অবিশ্বাস।

‘প্রযুক্তিটা রাশিয়ার, ইজরায়েলিরা চুরি করে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। মস্কো ইউনিভার্সিটির গবেষকরা নতুন এক ধরনের শেওলা আবিষ্কার করেছেন, বদ্ধ জায়গাতেও বেঁচে থাকতে পারে। এই শেওলাই অক্সিজেন তৈরি করছে।’

চিন্তার গতি আরও বাড়ল রানার। আর চল্লিশ মিনিট পর বিস্ফোরণ। ক্ষয় ক্ষতি হবে মারাত্মক, কিন্তু গোটা ফ্যাসিলিটিকে আবার কাজের উপযোগী করতে তিন থেকে চার মাসের বেশি সময় লাগবে না। অর্থাৎ, স্পেস স্টেশন অ্যাবির টেকনিশিয়ান আর অপারেটররা কোনও সমস্যায় পড়ছে না।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসও অক্ষত থাকছে।

সোজা কথায়, রানার মিশন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

মুখের ভিতরটা হঠাৎ তেতো হয়ে গেল ওর। ‘ওখানে নিয়ে

চলো আমাকে, যেখানে ব্রিফিং হচ্ছে,' বলল ও। 'ওদের আরও কথা শোনা দরকার...'

'কিন্তু জেলিগনাইট?' আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া। 'খানিক পরই তো ওগুলো ফাটতে শুরু করবে।'

'কথা বোলো না, থামো তো! ভেবেছ ভুলে গেছি আমি?' চাপা স্বরে ধমক দিল রানা। 'ওগুলোর এখন আর কোন গুরুত্ব নেই। আমি মিশনটা সফল করার উপায় খুঁজছি। হিসেবে ভুল হয়ে গেছে–এখন বুঝতে পারছি, স্পেস সেন্টার ধ্বংস করে কোন লাভ নেই, তারপরও আসমানের ওই কাঁচ অপারেট করা যাবে। তাই নতুন কোন বুদ্ধি দরকার। ওরা কী বলে শুনতে চাই।'

'এদিকে,' নিঃশব্দ পায়ে গাঢ় ছায়ার ভিতর ঢুকল সুরাইয়া।

সুরাইয়ার পিছু নিয়ে সাবধানে হাঁটছে রানা। তিন মিনিট পর ফিসফিস করল সুরাইয়া, 'এইখানে। জানালা দিয়ে ভিতরে তাকাও।'

সুরাইয়ার ঠিক পিছনে থামল রানা, তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাবার সময় সরু কোমরটা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে।

আধ খোলা জানালা, পর্দাটা একপাশে সরানো। ঘরের ভিতর যথেষ্ট আলো, তবে কামরাটা মোটেও পরিচ্ছন্ন বা সাজানো নয়। একটা স্পেস স্টেশনের ব্রিফিং রুম কেমন হয় জানা আছে রানার, তাই মেলাতে পারল না।

কাঠের দুটো পুরানো চেয়ারে দু'জন অ্যাস্ট্রনট বসে আছে। কেউই স্পেস সুট পরেনি। হাতে সাদা চক নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বোঝাচ্ছে তাদের মেজর বারাইদি।

সামনের দিকে আরেকটু ঝুঁকে কান পাতল রানা।

'...আমরা, ইহুদিরা, কখনও নিঃশেষ হয়ে যাই না। মরতে মরতে আবার বেঁচে উঠি। বাঁচিও বাঁচবার মত, দুশমনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, নরকের স্বাদ পাইয়ে দিয়ে।

'তবে আমরা অনেক ভুগেছি। জার্মানরা আমাদের মেরেছে।

এখন আরবরা আত্মঘাতী হয়ে মারছে। গোটা ইসলামী বিশ্ব আমাদের বিরুদ্ধে।

'এখন সময় হয়েছে ওদেরকে ভোগাবার, শায়েস্তা করার। এই দেখো, মুসলিম বিশ্বের ম্যাপ।' গোল পাকানো একটা মানচিত্র খুলে বোর্ডের গায়ে ঝুলিয়ে দিল বারাইদি। 'লক্ষ করো, দুনিয়ার প্রায় সব মুসলমান জড়ো হয়ে আছে এশিয়া আর আফ্রিকায়। সব মিলিয়ে এক-দেড়শো কোটি হবে। সংখ্যাটি বড় কথা নয়, বড় কথা শত্রুতা।

'ওরা, মুসলমানরা, চায় দুনিয়ার বুক থেকে ইহুদিরা চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। কিন্তু ঈশ্বর তো আমাদের পক্ষে। সেজন্যেই তো বড় বড় সব বিজ্ঞানী ইহুদির ঘরেই জন্মায়।

'আমরা নই, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুসলমানরা। ওরা মৌলবাদী, গোঁড়া, আধুনিক বিশ্বে পুরোপুরি বেমানান।

'হ্যাঁ, আমরাই ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করব। অথচ, মজার কথা হলো, ওরা টেরটিও পাবে না কে বা কারা ওদেরকে মেরে ফেলছে।

'ইচ্ছে করলে আমরা রাতারাতি ওদেরকে পুড়িয়ে মারতে পারি। তবে সেটা বিশ্ব পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিতে পারে।

'আমরা ওদের নদ-নদী, পুকুর-ডোবা, লেক, বিল ইত্যাদি জলাশয়ের সমস্ত পানি বাষ্পে পরিণত করব। প্রথমে ধরা হবে বাংলাদেশকে, কারণ ফকিরনীদের ওই দেশ থেকে প্রায়ই হামাস আর ইয়াসির আরাফাতকে সাহায্য করার জন্যে স্পাই আসে।

'এবারও সেরকম একজন এসেছে। লোকটাকে আমি আমার পরম শত্রু বলে মনে করি। তার নির্দেশে হামাস জঙ্গীরা আমার পেটে বিস্ফোরক ভর্তি ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তুফার মিলিটারি হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করে সেটা বের করতে

হয়েছে।’

রানার কাঁধ দুটো সামান্য ঝুলে পড়ল।

‘...প্রথমে পানি কেড়ে নেব, তারপর জ্বালিয়ে দেব ফসল। এক-দেড়শো কোটি মানুষের মুখের খাবার কেড়ে নেয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে।

‘এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ। রাশিয়া বা চীন মহাশূন্যে আমাদের সামরিক তৎপরতায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, তাই স্পেস স্টেশনে পৌঁছে মিলিটারি কমপ্লেক্সে অপটিক্যাল অবজারভেশন ইকুইপমেন্ট ফিট করবে তোমরা, আমাদের রেইডারে যাতে ওদের মিসাইলের গতিবিধি ধরা পড়ে।’ হাতঘড়ি দেখল বারাইদি। ‘সময় হয়ে এসেছে, কাজেই তোমাদেরকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখব...’

বারাইদির কথা শুনতে শুনতে চিন্তা করছিল রানা। আইডিয়াটা হঠাৎ ঢুকল মাথায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটাই কাজ করবার আছে।

সুরাইয়ার কনুই ধরে টান দিল রানা, জানালার পাশ থেকে সরিয়ে আনল গাঢ় ছায়ার ভিতর।

‘মন দিয়ে শোনো,’ ফিসফিস করে বলল ও। ‘দু’বার বলার সময় না-ও পেতে পারি। অ্যাস্ট্রনটরা একটু পরেই রওনা হবে। তুমি জানো কোথায় ওরা সুট পরে? মানে, কোন দালানটায়?’

‘এটার পাশের দালানে,’ বলে রানার পিছন দিকের একটা একতলা ভবন দেখাল সুরাইয়া।

‘গুড। শোনো, ওদের একটা সুট পরে অ্যাস্ট্রনট সাজব আমি...’

‘পাবে কোথায়?’

‘ওরা যখন পরার জন্যে আসবে, একটা সুট বাগিয়ে নেব আমি,’ বগলের কাছাকাছি হাতের ভিতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। বোঝাতে চাইল ছুরি

মেরে কাবু করবে একজন অ্যাস্ট্রনটকে, তারপর তার কাছ থেকে সুটটা কেড়ে নেবে।

'তারপর?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

'তারপর খেয়াযান জুবিলিতে চড়ে স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে উঠে যাব।'

মাথা নাড়ল সুরাইয়া। 'এতে কাজ হবে না,' বলল সে। 'তোমার প্ল্যান মোটেও সুচিন্তিত নয়।'

'কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই এই যে অ্যাস্ট্রনট একজন নয়, দু'জন। আর তুমি যদি খেয়াল করে না থাকো তো বলি—দু'জনের মধ্যে একজন মেয়ে। এর মানে হলো, তুমি শুধু লোকটার জায়গা দখল করতে পারবে। অর্থাৎ দু'জনের কাজ একা করতে হবে তোমাকে।'

দু'জনের একজন যে মেয়ে, ব্যাপারটা রানা সত্যি খেয়াল করেনি। এর কারণ সম্ভবত দু'জনেই প্যান্ট-শার্ট পরে ছিল, মেয়েটার চুলও পুরুষদের মত ছোট করে কাটা।

'তা ছাড়া, তোমার কি অ্যাস্ট্রনট ট্রেনিং নেয়া আছে? লঞ্চ কাউন্টডাউন শুরু হলে তুমি কোন ভুল করবে না, এরকম নিশ্চয়তা দিতে পারো?'

রানা স্বীকার করল, আনুষ্ঠানিক ট্রেনিং নেয়নি কখনও। তবে যুক্তি দেখাল, 'অ্যাস্ট্রনটদের আসলে প্রায় প্যাসেঞ্জারই বলা যায়। তা ছাড়া, গ্রাউন্ড থেকে রিমোটের সাহায্যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হ্যাঁ, আমাকে হয়তো অভিনয় করতে হতে পারে।'

'তোমার ভাষাই, অর্থাৎ বাচনভঙ্গি, তোমাকে ধরিয়ে দেবে।'

'না হয় তোতলাব। শোনো, সুরাইয়া, তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু আমার সামনে অন্য কোন উপায় নেই। আমাকে স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে পৌঁছাতেই হবে। ওটাকে আমি ধ্বংস করব অরবিট-এ।'

'তুমি মারা যাবে।'

‘সম্ভাবনা আছে,’ গম্ভীর সুরে স্বীকার করল রানা। ‘তবে এ রকম ঝুঁকি নেয়াটা আমার পেশার অঙ্গ।’

‘তোমার প্ল্যানে একটা মেয়ের প্রয়োজন–আমাকে,’ সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য দৃঢ় শোনাল।

দশ সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। ‘বেশ।’

রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সুরাইয়া। ‘ধন্যবাদ।’

লেকচার হল সংলগ্ন রেডি-রুমে ঢুকবার সময় ফাঁকা করিডর ধরে পা টিপে হাঁটল ওরা, অন্য একটা জানালা দিয়ে দেখল এখনও অ্যাস্ট্রনট দু'জনকে নির্দেশ দিচ্ছে মেজর বারাইদি।

রেডি-রুমে ঢুকেই প্রেশার সুট রাখবার র‍্যাকগুলো দেখতে পেল রানা। ওগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় পরীক্ষা করে দেখছে ওর কাঠামোয় কোন্‌টা ফিট করবে।

যে যার সাইজ খুঁজে নিয়ে সুট পরে নিল ওরা। ‘হেলমেট আটকাতে সাহায্য লাগবে,’ সুরাইয়াকে বলল রানা।

পরস্পরকে হেলমেট পরাল ওরা।

‘আর পনেরো মিনিট পর লঞ্চ,’ অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ঘোষণা প্রচারিত হলো। ‘অ্যাস্ট্রনট ক্রুরা শাটল্‌ জুবিলিতে চলে যান।’

মুখ তুলে লাউডস্পিকারের দিকে তাকাল রানা, তারপর হাতঘড়ি দেখল। এখন থেকে ঠিক ত্রিশ মিনিট পর বিস্ফোরণ ঘটবে।

‘আমি আমার বসকে একটা মেসেজ পাঠাই,’ বলে শার্টের বুক পকেট থেকে একটা ফাউন্টেন পেন টেনে নিয়ে খুলল রানা। নিবের মাথা ধরে টান দিতে সরু তার বেরুল, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। ওটা আসলে এরিয়াল। কলমের নীচের অংশটা ধরে দু'বার মোচড়াল, ইলেকট্রিক পাওয়ার তৈরি হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে নিবের পাশ থেকে আগুনের একটা ফুলকি ছুটল। টেলিগ্রাফ কী ব্যবহার করে কোডেড মেসেজ পাঠাল রানা বিসিআই হেডকোয়ার্টার

ঢাকায়। বলে রাখল, মহাশূন্য থেকে উত্তর কোরিয়ার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবে।

এই বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি যদি মনিটর করা হয়, ইজরায়েলি রেডিও টেকনিশিয়ানরা জেনে ফেলবে যে এখান থেকে কেউ একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। তবে কে পাঠিয়েছে জানতে সময় লাগবে।

ততক্ষণে মাটির বুক থেকে একশো বিশ মাইল উপরে থাকবে রানা।

যাচ্ছে মহাশূন্যে, সেখানে জেলিগনাইট বা পিস্তলের হয়তো কোন কাজ নেই, তবু ওগুলো রানা ফেলে যাচ্ছে না।

রেডি-রুম থেকে বেরুতে যাবে ওরা, এই সময় আঁতকে উঠল সুরাইয়া, খপ্ করে রানার একটা হাত ধরে বাধা দিল এগোতে।

'ওরা এদিকে আসছে!' ফিসফিস করল সে, ভয়ে ভেঙে গেছে কণ্ঠস্বর। ইঙ্গিতে বাইরের করিডরটা দেখাল। 'কিছু একটা করো!'

সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল রানা, ওর প্ল্যানটা কাজে লাগল না। শাটলে চড়ে স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

অ্যাস্ট্রনট দু'জনের সঙ্গে মেজর বারাইদিও আসছে। ওদের পাশে রয়েছে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছ'জন গার্ড, হাতে বাগিয়ে ধরা সাবমেশিন গান।

কামরার চারদিকে তাকিয়ে পালাবার পথ আছে কিনা দেখল রানা। নেই।

সুরাইয়াকে নিয়ে ঘরটার ভিতর আটকা পড়ে গেছে ও। সশস্ত্র গার্ড যেভাবে ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে রেখেছে, কল্পনার চোখে এই মুহূর্তে নিজেদের লাশ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না রানা।

দশ

'রানা, ওরা...' আতঙ্কে সুরাইয়ার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকে ধরে ঝাঁকাতে চেষ্টা করল রানা। হাতে ভারী আর মোটা গ্লাভস, পরনে কষ্টকর বোঝার মত চেপে আছে স্পেস সুট, নড়াচড়ায় বাধা পাচ্ছে ও—সুরাইয়াকে শুধু র‍্যাকের গায়ে চেপে ধরতে পারল। তবে এই নড়াচড়া ওকে আত্মরক্ষার একটা উপায় দেখিয়ে দিল, অনেকটা যেন চোখে আঙুল দিয়েই।

দৌড়ে বা পালিয়ে নয়, সেটা হবে আত্মহত্যার সামিল; বাঁচতে হলে নিজেদেরকে একজোড়া খালি স্পেস সুট হিসাবে চালাতে হবে, যেন ঝুলে আছে র‍্যাকে।

'চুপ!' হিসহিস করল রানা। 'সুটটা যে খোপ থেকে নিয়েছ সেটার ভেতর ঢুকে পড়ো। নড়বে না। এমনকী নিঃশ্বাসও ফেলো না, কারণ ফেসপ্লেটে বাষ্প জমতে পারে। ভান করো তুমি একটা খালি সুট।'

আর কিছু বলবার বা করবার সময় পাওয়া গেল না। দুই অ্যাস্ট্রনটকে নিয়ে রেডি-রুমে ঢুকতে যাচ্ছে বারাইদি। ওদের

দু'পাশে সশস্ত্র গার্ডরা মারমুখো ভঙ্গিতে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

দ্রুত ঘুরল রানা, চওড়া কাঁধ দুটো র‍্যাকের সরু খোপে ঢোকাল, তারপর চেষ্টা করল নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ হতে। চেষ্টাটা নিশ্চয় সফল হচ্ছে, কারণ কেউ তারা ওর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে না।

হেলমেটে লাগানো ব্লাস্ট ভাইজার নামিয়ে দিয়েছে রানা, ফলে মুখটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে আছে। তবে পাতলা প্লাস্টিকের ভিতর থেকে ওদের কথাবার্তা প্রায় সবই স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে।

'ফিরে এলে সামরিক এবং রাষ্ট্রীয় মেডেল পাবে তোমরা,' বলল বারাইদি।

হাসি হাসি মুখ করে পুরুষ অ্যাস্ট্রনট কাপড় ছাড়ছে।

মেয়েটা প্যান্ট-শার্টের উপরই পরছে স্পেস সুট। 'ক্যাপসুলে টার্গেটিং কমপিউটার তোলা হয়েছে তো, মেজর?' জানতে চাইল সে।

এই সময় তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শুনল রানা, যেন ওর পাশেই কোথাও খুদে একটা পটকা ফেটেছে। শব্দটা মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় করে তুলল ওকে। তারপর উপলব্ধি করল, আসলে কী ঘটেছে আর কোথায় ঘটেছে।

সুটের পজিশন না বদলে হেলমেটের ভিতর মাথাটা ঘোরাল রানা, দেখল সুরাইয়ার স্পেস সুট কাঁপছে। সে হাঁচি দিয়েছে।

'কীসের শব্দ হলো?' জিজ্ঞেস করল বারাইদি। চট করে একবার গার্ডদের উপর চোখ বুলাল। তারা মারমুখো ভাব নিয়ে কামরার চারদিকে তাকাচ্ছে, হাতের মেশিন গান তৈরি।

'ও কিছু না,' মেয়েটা বলল। 'এগুলো কী?' রানা আর সুরাইয়ার পরিত্যক্ত কাপড়চোপড়ে স্পেস-বুট পরা পা দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'এ-সব তো আমাদের কারও নয়।'

'গা–' শুরু করল বারাইদি।

দ্রুত তাকে চুপ করাল রানা। পরনে বিদঘুটে স্পেস সুট না

থাকলে পরপারেই পাঠিয়ে দিত, তার বদলে প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে অজ্ঞান করল। মেঝেতে ঢলে পড়ল সে।

অকস্মাৎ একটা স্পেস সুট জ্যান্ত হয়ে ওঠায় মুহূর্তের জন্য হলেও একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো, আর সেটাই বাঁচিয়ে দিল রানাকে। গার্ডরা ওর দিকে অস্ত্র ঘোরাবার আগেই নিজের ওয়ালথার বের করে ট্রিগার টিপতে শুরু করেছে ও।

দ্রুত চারটে গুলি করায় বাকি গার্ডরা কামরা ছেড়ে পালাল। একটা সাবমেশিন গানের এক পশলা গুলি বর্ষণে মারা গেল অ্যাস্ট্রনটদের একজন–মেয়েটা।

গার্ড কমান্ডার হুংকার ছেড়ে ফায়ারিং বন্ধ করতে বলল, সে চাইছে না মেজর বারাইদি আর অবশিষ্ট অ্যাস্ট্রনটও মারা যাক।

'জলদি, সুরাইয়া! এখান থেকে বেরুতে হবে!'

'কী ভাবে, রানা?'

'প্রথমে বাধাগুলো সরাই,' বলে ওয়ালথার সরিয়ে রেখে মেঝে থেকে একটা সাবমেশিন গান তুলে নিল রানা। পুরুষ অ্যাস্ট্রনট এই মাত্র একটা মেশিন গান তুলে নিয়ে ওদের দিকে ঘোরাচ্ছে।

সেটা সে অর্ধেকও ঘোরাতে পারেনি, তার বুক ঝাঁঝরা করে দিল রানা। ঘুরল ও, এবার বারাইদির পালা।

কিন্তু গার্ড কমান্ডার ইতিমধ্যে রানার ভূমিকা টের পেয়ে গেছে। ওকে লক্ষ্য করে ছুটল সে।

দু'জন একসঙ্গে গুলি করল। তবে, স্পেস সুট পরা অবস্থায়ও, রানার লক্ষ্য অব্যর্থ।

'রেডিওতে মেসেজ পাঠিয়ে আরও সৈন্য আনাবে ওরা,' বলল সুরাইয়া, একটা ঢোক গিলে নিজেকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করল। গার্ড কমান্ডারের মেশিন গানটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পিছু হটে জানালার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকাল। চট করে একবার চোখ বুলাল বাইরে। আপাতত ওরা এখানে নিরাপদ।

বারাইদিকে শেষ করবার জন্য আরেকবার অস্ত্র তুলল রানা,

কিন্তু হঠাৎ করে খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঢুকতে দেখে প্রাণ হাতে করে পালাবার পথ খুঁজতে হলো।

খুলবার সময় নেই, বন্ধ জানালা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল ও। পানির মত সহজেই ভাঙল কাঁচগুলো, তবে পাতলা প্লাস্টিকের হেলমেট হওয়ায় মাথায় বেশ জোরাল একটা ধাক্কা লাগল।

রানার পিছু নিয়ে হুড়মুড় করে জানালার নীচে পড়ল সুরাইয়া, সঙ্গে মেশিন গান থাকায় ভঙ্গিটা আড়ষ্ট।

চোখ বুলিয়ে বাইরের দৃশ্যটা দেখে নিল রানা। এরই মধ্যে স্পটলাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। মাথার উপর স্থির হয়ে রয়েছে একজোড়া হেলিকপ্টার গানশিপ, ওগুলোর ২০ এমএম কামান নিঃসন্দেহে মারাত্মক একটা হুমকি।

রুপালি স্পেস সুট পরে থাকায় পাইলটরা ওদেরকে পরিষ্কার চিনতে পারছে।

'ট্রাক, রানা!' হাত তুলে দেখাল সুরাইয়া। 'লঞ্চ প্যাডের ওদিকেই যাচ্ছে।'

স্পেস সুট দেখে সরল বিশ্বাসে ট্রাক থামাল ড্রাইভার। থুতনির নীচে মেশিন গানের মাজল চেপে ধরে তাকে নীচে নামাল রানা। হুমকি শুনে এক সেকেন্ডও দেরি করল না, উল্টো দিকে দৌড় দিল সে।

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে ট্রাক ছেড়ে দিল রানা।

'আমরা ভুল পথে যাচ্ছি,' দু'মিনিটও হয়নি, ওর পাশ থেকে বলল সুরাইয়া। 'সরাসরি রকেটটার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। সামনে তাকাও।'

সামনেই তাকিয়ে আছে রানা, কী ঘটছে দেখতেও পাচ্ছে।

এরই মধ্যে লঞ্চ প্যাডের দিকে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তায় সৈন্যরা ব্যারিকেড দিতে শুরু করেছে। ট্রাক দিয়ে ব্যারিকেড ভাঙবার কথা ভাবল ও। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিলও করে দিল। ঝাঁক ঝাঁক গুলি করে চাকা বলে কিছু রাখবে না সৈন্যরা।

ওদের আরও ভারী, আরও মজবুত কিছু দরকার। আর্মারড্ কিছু—যেটা গায়ের জোরে ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিয়ে এগোবে।

সে রকম একটা দেখতেও পেল রানা। ওদের পিছু পিছু আসছে একটা আর্মারড্ হাফ-ট্রাক।

দেরি না করে ইউটার্ন নিল রানা, ফুল ট্রাক সোজা তুলে দিল আর্মারড্ হাফ-ট্রাকের গায়ে।

সংঘর্ষের মুহূর্তে চিৎকার দিল সুরাইয়া, তবে লাফ দিয়ে নীচে নেমে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে-ই আগে ছুটছে। আরেক দরজা দিয়ে রানাও নামল, সংঘর্ষের সময় ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে হেলমেটটা ঠুকে যাওয়ায় কিছুটা আচ্ছন্ন বোধ করছে।

এক পশলা বুলেট বর্ষণে সুরাইয়ার হাতে মারা পড়ল হাফ-ট্রাকে যে-ক'জন সৈনিক ছিল।

'পিছনে ওঠো,' নির্দেশ দিল রানা। 'পিছু নিয়ে কেউ এলেই গুলি করবে। তবে সাবধান, মাথাটা বেশি ওপরে তুলো না।'

যেন মনে হলো কোন ্নাইপার ওর কথা শুনতে পেয়েছে, অকস্মাৎ একটা জোরালো ধাক্কা অনুভব করল হেলমেটে। সামান্য ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা। হোঁচট খেয়ে দুই কদম সামনে বাড়ল রানা, তারপর ভারসাম্য ফিরে পেয়ে স্থির হলো।

ট্রিগারের পেঁচানো আঙুলটায় টান পড়ল, চারদিকে কয়েক পশলা গুলি করল রানা। মেশিন গান নিঃশেষ হয়ে যেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, লাফ দিয়ে উঠে বসল হাফ-ট্রাকে। স্টার্ট দেওয়াই ছিল, ভারী আর্মারড্ ভেহিকেল ব্যারিকেড লক্ষ্য করে ছুটল।

স্পীড ঘণ্টায় ত্রিশ কিলোমিটার। গায়ে স্পেস সুট আর মাথায় হেলমেট থাকা সত্ত্বেও সরাসরি সংঘর্ষে শরীরের সমস্ত হাড় যেন পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে গেল। সামনের চাকা বাধা পেয়ে উপরে উঠল, বাধা উতরে এল, তারপর অ্যাসফ্যাল্ট টারমাকে কামড় বসাল ট্র্যাক। খুদে একটা রকেটের মত হাফ-ট্রাকের নাক উঁচু হলো, পরমুহূর্তে তীরবেগে ছুটল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ওরা,

ইঞ্জিনকে আবার খেপিয়ে তুলল রানা।

ওদিকে পিছন থেকে ধাওয়া করছে সৈন্যরা। অবশ্য সুরাইয়ার মেশিন গান দূরে সরিয়ে রেখেছে তাদের। আর যাই হোক, গুলি করে সৈন্যরা পিছনের টায়ার ফুটো করতে পারবে না—যেহেতু চাকার কোন অস্তিত্বই নেই। ট্র্যাকের ধাতব দাঁত পাকা রাস্তা কামড়ে ছুটছে, সামনের চাকা ফেটে চ্যাপ্টা হয়ে গেলেও কোন সমস্যা হচ্ছে না।

'বুলেট শেষ!' সুরাইয়ার চিৎকার শুনল রানা।

এখন আর কিছু আসে যায় না। রকেটের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। মনে মনে রানা প্রার্থনা করছে অটোমেটিক সিকোয়েন্স যেন ইন্টারনেট-এ যেমন দেখেছে সে রকমই হয়—কাউন্টডাউন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছালে, লঞ্চ প্রক্রিয়া সচলই থাকবে, কোন অবস্থাতেই বন্ধ হবে না। কোথাও যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে, গোটা রকেট ধ্বংস হয়ে যাবে।

ধ্বংস!

শব্দটা কী যেন মনে করিয়ে দিতে চাইল রানাকে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই ওর। পরে দেখা যাবে।

'কী ঘটছে, সা—?' রকেটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল একজন গ্রাউন্ড ক্রু। কথাটা তাকে শেষ করতে দিল না রানা। ফ্লাইং কিক মারল ও।

ছিটকে পড়ল লোকটা, রক্ত আর ভাঙা দাঁত বেরুল মুখ থেকে।

সুরাইয়াকে ধরে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে এল রানা। রকেটের গোড়ার কাছাকাছি এটা একটা ইস্পাতের দরজা। ঢুকে দেখে ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

কামরাটা অ্যাস্ট্রনটদের জন্য তৈরি করা একটা স্টেজিং এরিয়া। এখান থেকে একটা ধাতব খাঁচা সরাসরি রকেটের কাছে

পৌঁছেছে। আসলে ওটা একটা এলিভেটর, অ্যাস্ট্রনটদের ক্যাপসুলে তুলে দেয়। ক্যাপসুলটা তিন প্রস্থ বুস্টার রকেটের মাথার দিকে।

'কে আপনি?' কামরার ভিতর পা রাখতেই চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল এক লোক।

তার ওভারঅলের কলার খামচে ধরে টান মারল রানা, তারপর ছেড়ে দিল। ধাতব দেয়ালে বাড়ি খেল সে, তারপর নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে। গোটা দুয়েক লাথি মেরে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল রানা তাকে। ছুটে আসা সৈন্যদের ছোঁড়া একটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইস্পাতের ভারী দরজা বন্ধ করছে, লোকটা কাতর কণ্ঠে বলল, 'আর মাত্র দশ মিনিট পর লঞ্চ। প্লিজ...'

বাকিটা রানার শুনবার ধৈর্য হলো না, দরজা বন্ধ করে বোল্ট টেনে দিল। 'সুরাইয়া, খাঁচাটা নীচে নামাও!'

লাল একটা বোতামে ঝাপটা মারল সুরাইয়া। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক মোটর স্টার্ট নেওয়ার গুঞ্জন শোনা গেল। এলিভেটর নীচে নামছে।

এলিভেটরের ভিতরে চড়ে রানার জন্য অপেক্ষা করছে সুরাইয়া। 'কী হলো, রানা?' ডাকল সে।

দরজার গায়ে জেলিগনাইটের শেষ স্টিকটা বসাচ্ছে রানা, জবাব দিল না। ঠিক বাইরেই জড়ো হয়েছে সৈন্যরা, দরজাটা কী ভাবে খোলা বা ভাঙা যায় পরামর্শ করছে। তাই মাত্র দশ সেকেন্ড পর বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা করল ও।

এক ছুটে এলিভেটরে ঢুকল রানা। ঢুকবার মুহূর্তে শক ওয়েভের ধাক্কা খেল পিঠে। সুরাইয়ার বাড়ানো দু'হাতের মাঝখানে পৌঁছে গেল ও।

'খাঁচা উপরে তোলো!'

বিস্ফোরণে ইস্পাতের দরজা উড়ে গেছে, মারা গেছে কম

করেও দশজন ইজরায়েলি সৈন্য। আহতদের সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার কথা। অক্ষত সৈন্যরা তাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্টেজিং এরিয়ায় ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ।

তবে কয়েক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল। খাঁচার পাশে লেগে এদিক সেদিক ছিটকে গেল সেগুলো, জাল ফুটো করে একটাও ঢুকল না ভিতরে।

রকেটটা বিশতলা বাড়ির সমান উঁচু, ধীরগতি এলিভেটর পৌঁছাতে প্রচুর সময় নিল। এমনকী দরজাটাও যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতার সঙ্গে খুলছে। তবে রানার শক্ত করা একটা মুঠো বিদ্যুৎবেগে ছুটল। জুত মত লাগায় টেকনিশিয়ান লোকটার চোয়াল ভেঙে গেল। পড়ে যাচ্ছে, ধরে তাকে খাঁচায় বের করে আনল রানা।

'আর কেউ আছে এখানে?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্যাপসুলের চারদিকটা দেখে নিয়ে সুরাইয়া নিশ্চিত করল, আর কেউ নেই।

খেয়াযান জুবিলির হ্যাচ ক্ষুধার্ত গণ্ডারের মুখের মত ফাঁক হলো। ভিতরে তাকিয়ে বহুরঙা ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলতে নিভতে দেখল রানা।

সুরাইয়ার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল ও। পাইলটের সিটে বসল ও। হ্যাচ বন্ধ করে ওর পাশের সিটে চলে এল সুরাইয়া।

কন্ট্রোল প্যানেলের একটা টাইমারে কাউন্টডাউন-এর স্টেটাস দেখা যাচ্ছে।

আর তিন মিনিট পর টেক-অফ।

এগারো

ধ্বংস! আবার সেই অস্বস্তিকর চিন্তাটা উদয় হলো রানার মাথায়। কী যেন মনে পড়তে চাইছে। এবার তাগাদাটা খুব জোরালো।

তারপর, অবশেষে, মনে পড়ল।

গড়গড় করে অনেক কথা বলে গেছে বারাইদি, তার ভিড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল তথ্যটা।

ইজরায়েলিদের খেয়াযান বিদেশে তৈরি। কোন কারণে ওটা যদি পথ হারিয়ে অন্য কোনও দিকে ছোটে, তা হলে বিপদ। যে দেশে গিয়ে পড়বে সে দেশের সরকার জেনে ফেলবে ইজরায়েলকে কারা রকেট বা স্পেস ক্যাপসুল সরবরাহ করেছে। সেজন্য প্রতিটি মহাশূন্যযানের ভিতর বোমা ফিট করেছে তারা। যদি দেখে ওগুলো বিপথে চলে যাচ্ছে, রিমোটের সাহায্যে গ্রাউন্ড থেকেই ফাটিয়ে দিতে পারবে।

বারাইদি বেঁচে আছে। সৈন্যরা আছে খেপে। রিমোট ব্যবহার করে বোমাটা না ফাটাবার কোন কারণ নেই। ফাটলে রানা আর সুরাইয়াকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিতে হবে।

কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বুলাবার সময় নিজেকে বোকা বোকা লাগল রানার। এর আগেও রকেটে চড়েছে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে এটার কন্ট্রোল প্যানেলের কোনই মিল খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু যে নতুন তা নয়, অত্যন্ত জটিলও লাগছে।

সঠিক নিয়ম ধরে, সাবধানে কন্ট্রোল প্যানেল অপারেট করতে হবে। সামান্য একটু ভুলের পরিণতিতে এত বড় খেয়াযান স্রেফ এক রাশ ধোঁয়া হয়ে যেতে পারে।

'আমরা কী করব বলো তো? অ্যাস্ট্রনটদের কাজ নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা নয়?' জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

'না। কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না। এরকম কন্ট্রোল প্যানেল আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ,' বলল সুরাইয়া, সিরিয়াস।

প্রথম কাজ বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করা, ভাবল রানা। 'বাতাস! আমাদের অক্সিজেন দরকার। হোস খোঁজো, সেগুলো আমাদের সুটে আটকাতে হবে।'

মোটা গদি লাগানো কাউচ-এর কাছাকাছি, নাগালের মধ্যে ডুয়েল অক্সিজেন ফিড আর এগজস্ট টিউব পাওয়া গেল। এয়ার সিস্টেমের সঙ্গে পরস্পরকে সংযুক্ত করল ওরা।

হিলিয়াম-অক্সিজেনের মিকশ্চার সুটের ভিতর ছড়িয়ে পড়তে গরম ভাবটা দূর হলো।

'এরপর কী?' আবার জানতে চাইল সুরাইয়া।

কন্ট্রোল প্যানেলের মিটমিটে আলোগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। একটা ঘড়ি ওর দৃষ্টি কাড়ল। আন্দাজ করল, এটাই কাউন্টডাউন ক্লক।

আর পুরো দু'মিনিটও বাকি নেই।

'প্যানেলে কোন লাল আলো জ্বলে কি না খেয়াল রাখো,' সুরাইয়াকে বলল রানা। 'লাল মানেই যেহেতু বিপদ, দেখামাত্র নেভাবার ব্যবস্থা করবে।'

ওর চোখেই সেরকম, অর্থাৎ লাল, একটা আলো ধরা পড়ল–ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। ওটার নীচের বোতামটায় হাত দিয়ে ঝাপটা মারল রানা। মিট মিট করা বন্ধ হলো, তবে যেন কোন দৈত্যের চোখের মত নিষ্পলক তাকিয়ে আছে–নিভছে না।

তারপর হঠাৎ সবুজ হয়ে গেল।

কন্ট্রোল প্যানেল জটিল তো বটেই, মার্কিং আর রাইটিংগুলোও ইংরেজি বা হিব্রুতে লেখা হয়নি, লেখা হয়েছে সাংকেতিক ভাষায়।

প্রথম কাজ প্রাণ বাঁচানো। 'সেফটি হারনেস!' বলল রানা। 'হারনেস! জলদি!'

সময় আছে মাত্র এক মিনিট চার সেকেন্ড।

দু'জনেই ওরা ব্যস্ত হাতে সেফটি হারনেস পরছে। কাজটা শেষ হওয়ার পর আবার ঘড়িটার দিকে তাকাল রানা। ওরা মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হবে এখন থেকে ঠিক আটান্ন সেকেন্ড... সাতান্ন সেকেন্ড... ছাপ্পান্ন সেকেন্ড পর।

'মেজর এবরান বারাইদি বলছি,' রেডিও থেকে ভেসে এল মোসাদ এজেন্টের কণ্ঠস্বর–এত কর্কশ, কেউ যেন কংক্রিটের উপর কোদাল ঘষছে। 'স্পাই দু'জনকে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা যারা আমাদের খেয়াযান জুবিলির ভেতর লুকিয়েছ। সময় থাকতে আত্মসমর্পণ করো, তা না হলে মারা পড়বে। আমরা অপেক্ষা করছি, ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে এসো।'

'রানা!' হাত বাড়িয়ে রানার কনুই ধরল সুরাইয়া।

'শান্ত হও। ওর কথায় কান দিয়ো না। একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছানোর পর এ-সব আপনা থেকেই ফায়ার হয়। জুবিলিকে এখন ওরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'আঙুল চোষো, বারাইদি,' হেলমেট মাইক্রোফোনে বলল রানা।

'ও, আচ্ছা, তা হলে যা সন্দেহ করেছি তাই–তুমি রানা!'

'এটা কী সন্দেহ করার মত কিছু? আমিই তো, এখানে আমারই তো থাকার কথা।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'সিকোয়েন্সিং ক্লক বলছে, আর ত্রিশ সেকেন্ড সময় আছে।'

'তুমি বাঁচবে না, রানা। এটা একেবারে ধ্রুব সত্য। যদি না এখনই ধরা দাও।'

'তুমি বরং তোমার সৈন্যদের সরিয়ে নাও। রকেট ওয়াশ ওদেরকে বিশ সেকেন্ডের মধ্যে গলিয়ে প্রোটোপ্ল্যাজম বানিয়ে ছাড়বে।'

‘তুমি ভাবছ, আমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি?’ জিজ্ঞেস করল বারাইদি, কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ। ‘না কি তুমি এতই বোকা যে মরতে ভয় পাচ্ছ না?’

‘আর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড, রানা!’ রুদ্ধশ্বাসে বলল সুরাইয়া।

রকেট ইঞ্জিন জ্যান্ত হতে চলেছে। এক মিনিট হলো একটা ফুয়েল পাম্প কাজ শুরু করেছে, ফায়ারিং চেম্বারে সাপ্লাই দিচ্ছে লিকুইড অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন। সুরাইয়া যখন মুখ খুলল, তখনই ইগনিশান ঘটল–অর্থাৎ আগুন ধরল ফুয়েলে।

রানা অনুভব করল ওর নীচে প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হচ্ছে।

ক্লক ফ্ল্যাশ করছে: জিরো-জিরো-জিরো...

রানা অনুভব করল, ওর বুকে কেউ ঝাঁপ দিয়েছে। প্রথমে চাপটা সহনীয় লাগল। পাঁচ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সহ্য করবার মত থাকল না।

নাজাফি স্পেস স্টেশন ছেড়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠছে রকেট। লেজটা তীব্র আগুনের তৈরি, কংক্রিট আর ইস্পাত গলিয়ে ফেলছে।

এই সময় বারাইদির কথাটা শুনতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পীড়ন তুচ্ছ হয়ে গেল। বারাইদির সম্ভবত মনে নেই যে কন্ট্রোল বাঙ্কারের মাইক্রোফোনটা বন্ধ করা হয়নি।

‘...চল্লিশ সেকেন্ডে ডেটোনেট। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলা হবে, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে টেক অফ করার একটু পরই আকাশে বিধ্বস্ত হয়েছে।’

শরীরটা কাউচ বা সিটের সঙ্গে এমন ভাবে সেঁটে আছে, রানা প্রায় অসহায়, নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত পাচ্ছে না। অথচ এখন থেকে ঠিক চল্লিশ সেকেন্ড পর একটা বোমা ফাটবে ক্যাপসুলের ভিতর।

সেই বোমাটা কোথায় লুকানো আছে তাও ওর জানা নেই।

উন্মত্ত একটা ভাব চলে এল রানার চেহারায়। কোন সূত্র পাওয়ার আশায় কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ বুলাল।

পেল না কিছু।

ক্লকটা এখন অন্য মেসেজ দিচ্ছে। ফ্লাইট শুরু হবার পর থেকে বয়ে যাওয়া সময় জানাচ্ছে: পাঁচ সেকেন্ড।

রানার হাতে সময় আছে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড। এর মধ্যে বোমাটা খুঁজে নিয়ে অকেজো করতে হবে।

কিন্তু কী ভাবে?

সুরাইয়াকে কিছু বুঝতে দিয়ো না!

হায় খোদা!

রকেটের প্রবল গতি সিটের সঙ্গে চেপে রেখেছে ওকে, বোমাটা কীভাবে খুঁজবে ও? ইজরায়েলি বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই সেটা অ্যাস্ট্রনটদের নাগালের মধ্যে রাখেনি। ইহুদি অ্যাস্ট্রনটরা এত বোকা নয় যে তারা বিল, মাইক আর ব্যারির মত মরতে চাইবে।

এই তিনজন আমেরিকান অ্যাস্ট্রনটের নাম রানার মনের পরদায় কী কারণে কে জানে জ্বলজ্বল করছে।

লোকগুলো অনেক বছর আগে ট্রেনিং নেওয়ার সময় গ্রাউন্ডে মারা যায়। মৃত্যুর কারণ ছিল নির্ভেজাল অক্সিজেন ব্যবহারে অসতর্কতা।

পিওর অক্সিজেনে আগুনের একটা ফুলকি পড়ায় চোখের পলকে সর্বগ্রাসী আগুন জ্বলে ওঠে।

আর এই ঘটনা ইজরায়েলিদের না জানবার কোন কারণ নেই।

বিদ্যুচ্চমকের মত ঝট্ করে সূত্রটা পেয়ে গেল রানা। স্পেস ক্যাপসুলে, ওর নাগালের মধ্যে কোথাও যদি বোমাটা থেকে থাকে, সেটাকে অবশ্যই থাকতে হবে অক্সিজেন বটলগুলোর কাছে।

'সুরাইয়া, হেলপ মি!' প্রায় গর্জে উঠল রানা। কিন্তু পরক্ষণে হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন।

রকেটের গতি আরও বেড়ে যাওয়ায় সিটের সঙ্গে সুরাইয়া

এমনভাবে সেঁটে আছে, প্রাণটা শুধু যেন বেরিয়ে যাওয়া বাকি।

যা করবার একার চেষ্টায় করতে হবে রানাকে।

বারাইদি চল্লিশ সেকেন্ডে ডেটোনেট করবে। ক্লক সময় দিচ্ছে: তেইশ।

লোহার মত ভারী হাতটা তুলে অক্সিজেন হোস ধরল রানা। হোসের নীচের দিকে নামছে হাত। যতটা কঠিন ভেবেছিল, কাজটা তত কঠিন লাগছে না।

ঠাণ্ডা মেটাল ফিটিংস-এর স্পর্শ পেল। সঙ্গে আরও কিছু একটা। কী হতে পারে? ইমার্জেন্সি মেডিকেল কিট। ফুড স্টোরেজ। কিংবা সূত্র নির্ভুল হয়ে থাকলে—অক্সিজেন বটলের পাশে একটা বোমা। নিশ্চয়ই তাই।

হ্যাঁ, তাই।

আঙুলের ছোঁয়া দিয়েই আকৃতিটা চিনতে পারল রানা। এটা ব্রিটিশ ল্যান্ডমাইন, ইজরায়েলি সেনাবাহিনী অনেক দিন থেকে ব্যবহার করে আসছে।

এই ল্যান্ড মাইনের সঙ্গে রানার পরিচয় আছে। স্মরণ করবার চেষ্টা করছে, কীভাবে ফিউজ করতে হয়।

ক্লক সময় দিচ্ছে: একত্রিশ সেকেন্ড।

জীবন-মরণ সঙ্কট হাত আর আঙুলকে অতিরিক্ত শক্তি যোগাল। মাইন-এর মাথার সামান্য ফোলা অংশটা আঙুল দিয়ে অনুভব করল রানা। যত জোরে পারা যায় মোচড়াচ্ছে ওটা।

তেত্রিশ সেকেন্ড।

রানার কাঁধের পেশী ছিঁড়ে যাবে বলে মনে হলো, মনে হলো ফুসফুসের বাতাস বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে। তারপরও মাইনের মাথা মোচড়াচ্ছে। অনুভব করল, চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে, যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। না! মনে মনে, নিঃশব্দে, গর্জে উঠল। এখন জ্ঞান হারালে মারা যাবে ও! হাতের কাজটা শেষ না করে মরলে দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় কয়েকশো কোটি

মানুষ ইজরায়েলের হাতে জিম্মি হয়ে পড়বে।

পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড।

হাতে আর আঙুলে আরও জোর খাটাল রানা। মনে হচ্ছে, কাঁধের পেশী এই বিচ্ছিন্ন হলো বলে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও, কিন্তু গতিজনিত প্রচণ্ড চাপ সেই চিৎকার গলার ভিতরই আটকে রাখল। আঙুল আরও শক্ত হলো। আরও আধ পাক ঘুরল জিনিসটা।

এটাই ডেটোনেটর। আর বোধহয় আধ পাক ঘোরালেই কাজ হবে। কিন্তু সময় পাওয়া যাবে না।

আটত্রিশ সেকেন্ড।

জিনিসটা আর ঘুরছে না। রানার গলা চিরে তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল। ফুসফুস যেন জ্বলছে। বুকটা মনে হলো ভিতর দিকে ডেবে গেছে। পাথরে পরিণত হয়েছে হাত। থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে গেছে আঙুলগুলো। পচা তরমুজের মত ফেটে যেতে চাইছে মাথা। আরও জোরে, রানার গলা দিয়ে যেন একটা দানবের আর্তচিৎকার বেরুচ্ছে।

চল্লিশ সেকেন্ড।

ডেটোনেটর মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

পেশীতে ঢিল দিল রানা। বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ভয় দূর হয়েছে। হঠাৎ খেয়াল করল, তীব্র গতির ফলে এখন আর কোন চাপ অনুভব করছে না। মেইন বুস্টার তার সমস্ত ফুয়েল খরচ করে ফেলেছে, ফলে বুস্টার ইঞ্জিনের কাজ শেষ। যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে খেয়াযান জুবিলির। চোখের কোণ দিয়ে সুরাইয়াকে নড়তে দেখে তাকাল রানা।

'সত্যি তুমি বেঁচে আছ?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল ও।

'স্রেফ ভাগ্যগুণে,' বলল সুরাইয়া। 'জানো, সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে।'

ডেটোনেটরটা রানা ফেলে দিয়েছিল। কাজল কালো চোখ

দিয়ে সেটার দিকে তাকাল সুরাইয়া–শূন্যে, তার আর রানার মাঝখানে, ভেসে রয়েছে ওটা। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল সে।

'থামো।'

'কিন্তু কিছু একটা খুলে এসেছে। বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'বিপদ, না?' হেসে উঠল রানা। 'না, সুরাইয়া, আপাতত কোন বিপদের ভয় নেই।' ডেটোনেটরটা ধরে সুটের পকেটে রেখে দিল।

কাউচে হেলান দিল ও। কয়েক সেকেন্ড পরই ঘুম চলে এল চোখে।

বারো

ওজন না থাকবার ব্যাপারটা উপভোগ করছে রানা। হারনেস খুলে সামান্য একটু নড়তেই শূন্যে উঠে এসে ভেসে থাকল। ওজনের কোন অনুভূতিই হলো না।

তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ও। অ্যাবি স্পেস স্টেশন পৃথিবীর যেদিকটায় আছে, ওরা রয়েছে ঠিক তার উল্টোদিকে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট বা আরও কম সময়ের মধ্যে ইজরায়েলিদের ওই স্পেস স্টেশনে ভিড়বে ওদের এই রকেট, যদি সমস্ত অটোমেটিক ইকুইপমেন্ট আর প্রি-প্রোগ্রামড্ অনবোর্ড কমপিউটার ঠিকঠাক মত কাজ করে।

ওই স্পেস স্টেশনে ইহুদি অ্যাস্ট্রনটরা আছে। হয়তো আছে ইজরায়েলি সামরিক বাহিনীর লোকজনও।

পিস্তলের স্পর্শ নিল রানা। ডেটোনেটরটাও পকেটে আছে। এ-সব কী ব্যবহার করা সম্ভব হবে? কিংবা ব্যবহার করবার সুযোগ পাওয়া যাবে?

স্পেস সেন্টারের লোকজন ওদের কোন ক্ষতি করতে না পারলেও, একটা মেসেজ পাঠিয়ে স্পেস স্টেশনের লোকজনকে নিশ্চয়ই সাবধান করে দিয়েছে।

স্টেশনের অ্যাস্ট্রনট আর সৈন্যরা ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

কী ভাবে পৌঁছালে ভাল হয় ভাবছে রানা। ফ্রেমে আটকানো ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধ্বংস করবার একটা উপায় বেরুত, ও যদি রকেটটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কলা-কৌশল শিখে নিতে পারত। স্টেশনে না ভিড়ে, রকেট ফায়ার করে গ্লাসে গুঁতো মারা যেত। কিংবা স্পেস স্টেশনে গুঁতো মেরে খুন করতে পারত যে-ক'জন আছে ওখানে।

ইতিমধ্যে আবার নিজের কাউচে ফিরে এসেছে রানা, হারনেস আটকে তাকিয়ে আছে সুরাইয়ার দিকে।

সুরাইয়া চেঁচিয়ে উঠল: 'রানা, দেখো!'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রেইডারে তাকাল রানা। স্ক্রিনে সবুজ আলোর ধীরগতি সরু রেখাটা খুদে একটা বিন্দুকে ছুঁয়ে যাবার সময় বিপ-বিপ আওয়াজ করছে। বিন্দুটা যত কাছে চলে আসছে, আলোর রেখাটাও তত জোরে শব্দ করছে।

'এ নিশ্চয়ই স্পেস স্টেশন অ্যাবি,' বলল রানা। ট্র্যান্সপারেন্ট কোয়ার্টজ পোর্ট দিয়ে বাইরে তাকাল ও। তবে কিছু দেখতে পেল না। দূরত্ব এখনও খুব বেশি। তবে উজ্জ্বল একটা ঝলক দেখতে পেল। ওটা নিশ্চয়ই ইজরায়েলিদের সেই অস্ত্র, রানা যেটাকে ধ্বংস করতে চাইছে–ম্যাগনিফাইং গ্লাস–রোদ থেকে সংগ্রহ করা

তাপ কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ গুণ বাড়িয়ে ঢেলে দিচ্ছে নীচের পৃথিবীতে।

এই মুহূর্তে ওটা কি বাংলাদেশের খেত-খামার আর ফসল পোড়াচ্ছে? নাকি মুসলিম বিশ্বের কোন দেশের নদী-নালা শুকিয়ে খটখটে করে ফেলছে?

'আমি দেখতে পাচ্ছি, রানা। তবে রেইডার রিটার্ন বড় অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত মানে?'

'স্টেশনের যে বিশাল আকার, তার তুলনায় রেইডার ইমেজ খুবই ছোট।'

সুরাইয়ার চোখে ছোট একটা টেলিস্কোপ, ক্যাপসুলের কোন কেবিনেট থেকে পেয়েছে। তার হাত থেকে সেটা নিল রানা, ভেসে খানিকটা উপরে উঠল, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল।

যেন লাফ দিয়ে সামনে চলে এল অ্যাবি স্পেস স্টেশন। ঠিক পিছনেই রয়েছে সোলার গ্লাস। টেলিস্কোপে ওটাকেই আসলে দেখেছে সুরাইয়া। এখন রানা বুঝতে পারছে রেইডার ব্লিপ-এর আকার যেমনটি হওয়ার কথা তেমনটি কেন হয়নি। রেইডারে স্পেস স্টেশনেরই ইমেজ ধরা পড়েছে। সেটা তত বড় নয়।

বড় হলো সোলার গ্লাসটা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিরেট নয়। একটাও নয়। বিশাল মাকড়সার জালের মত দেখতে, জালের অসংখ্য বাহুতে আটকে আছে অগুনতি চ্যাপ্টা আতসী কাঁচ। জালের বাহু আসলে তার–পিয়ানো ওয়য়্যার। ওই তার দিয়েই গোটা কাঠামোটা তৈরি করা হয়েছে–আকৃতিটা গোল, পাতিলের ঢাকনি বা ডিশ অ্যান্টেনার মত ভিতর দিকে ঢালু। হাজার হাজার ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে সূর্যের আলো পৃথিবীর দিকে ফোকাস করতে এই আকৃতিই বোধ হয় দরকার। বারাইদির মুখে শুনে এ-সব রানা

পুরোপুরি সত্যি বলে বিশ্বাস করেনি। এখন দেখছে, লোকটা কিছু বাড়িয়ে বলেনি।

'ওরা বড় একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস লঞ্চ করেনি,' ফিসফিস করল রানা। 'ছোট আকারের কাঁচ এনে, একটা একটা করে তারের সঙ্গে বেঁধেছে। ওদেরকে কাজ করতে হয়েছে কক্ষপথে ভাসমান অবস্থায়। অবিশ্বাস্য।'

'কন্ট্রোল, রানা!' হঠাৎ আঁতকে উঠল সুরাইয়া। 'কন্ট্রোল আপনাআপনি কাজ করছে।'

ঝট করে তাকাতে রানা দেখল সুরাইয়া ঠিক কথাই বলছে। আলোর জ্বলা-নেভা এখন সম্পূর্ণ নতুন একটা প্যাটার্ন ধরে ঘটছে।

তবে এর জন্য গ্রাউন্ড কন্ট্রোল দায়ী হতে পারে না, নাজাফি স্পেস স্টেশন এই মুহূর্তে দুনিয়ার উল্টো পিঠে। হয় অ্যাবির অ্যাস্ট্রনটরা জুবিলির কন্ট্রোল নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, নয়তো পূর্ব-নির্ধারিত একটা রুট অনুসরণ করছে ক্যাপসুল। রানার মনে হলো, বড়শী গাঁথা মাছের মত লাইন গুটিয়ে ওদেরকে স্পেস স্টেশনের ভিতর টেনে নিচ্ছে ইজরায়েলি ক্রুরা।

'কাঁচগুলো এখনই নষ্ট করতে হবে,' সুরাইয়াকে বলল রানা। 'এরপর হয়তো আর সময় পাব না।'

'কিন্তু কীভাবে? এখনও তো অনেক দূরে ওটা। তা ছাড়া, করার কী সত্যি কিছু আছে?'

ডেটোনেটরটা মুঠোয় নিয়ে রানা ভাবল, সুরাইয়া ঠিকই বলছে–ওদের তেমন কিছু করবার নেই। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় তিন মাইল জিনিসটা, ছোট্ট এতটুকু বিস্ফোরক ওটার কী-ই বা ক্ষতি করতে পারবে। এমনকী এরচেয়ে অনেক বড় বিস্ফোরণেও ওটার আংশিক ক্ষতি হবে শুধু, প্রায় সবটুকুই অক্ষত থেকে যাবে।

তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে ওকে। সেটাই ওর কাজ।

'তোমার সব ঠিক আছে তো? অক্সিজেন লাইন?'

‘ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কী করছ?’

হ্যাচটা মাথার উপর। ওটা খুলে ফেলল রানা। অকস্মাৎ বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় হারনেসটা প্রায় কামড় বসাল গায়ে। ওজনহীনতার পর ওই চাপ ভালই লাগল। মুখ তুলে আকাশে তাকাল ও, হীরার ধার নিয়ে আলোর রেখা ছড়াচ্ছে নক্ষত্রগুলো। যেন লক্ষ করছে ওকে, বিশ্লেষণ করছে ওর আচরণ। ওকে সফল হতে হবে।

সাবধানে হারনেস খুলে সিধে হলো রানা, মাথাটা বেরিয়ে এল ক্যাপসুল থেকে। হাতে ডেটোনেটর, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রকাণ্ড জালটার দিকে। তারপর যত জোরে পারা যায় বিস্ফোরকটা ছুঁড়ল।

খুদে বিস্ফোরক প্রায় চোখের পলকে দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রানা অপেক্ষা করছে। কিন্তু কিছু ঘটল না। এক সময় মনে হলো অনন্তকাল পার হয়ে যাচ্ছে।

তারপর মাত্র একটা কাঁচ বিস্ফোরিত হতে দেখল ও। এটাকে আসলে কোন ক্ষতিই বলা যায় না। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তৈরি বিশাল ডিশটা প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল।

পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করল রানা। আউটার স্পেসেও নিশ্চয় পিস্তল থেকে ফায়ার হয়।

লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টেনে দিল রানা। ওয়ালথার লাফিয়ে উঠল ওর হাতের ভিতর। পিছন দিকে ছিটকে, দেয়ালে বাড়ি খেল শরীরটা। তবে এ-সবই ঘটল পরিপূর্ণ নীরবতার ভিতর।

একের পর এক গুলি করে গেল রানা। খরচ হওয়া পিতলের খোল মহাশূন্যে ইজেক্ট হচ্ছে। হেভি নাইনএমএম প্যারাবেলাম রাউন্ড নিঃশব্দে ছুটে যাচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাসগুলোকে ভেঙে চুরমার করবার জন্য।

গুণে গুণে ছয়টা কাঁচ ভাঙল রানা। পাঁচটা বুলেট দিয়ে,

একটা ডেটোনেটরের সাহায্যে।

আরও হাজার হাজার অক্ষত রয়ে গেল।

'রানা, আমরা স্টেশনে ভিড়তে যাচ্ছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল, সত্যি তাই। বোঝাই যায় অ্যাবির এক পাশে গাঢ় অন্ধকার ফাঁকটার ডিজাইন করা হয়েছে জুবিলির সামনের অংশটা যাতে ওটার ভিতরে সেঁধোতে পারে। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পেস স্টেশনের ভিতর ঢুকবে ওরা। নয়তো মারা যাবে।

খেয়াযান জুবিলি স্টেশনে ভিড়ল। মেকানিকজম খাপে খাপে বসেছে। এখন হ্যাচ খুলে সরাসরি একটা এয়ার লক-এ পৌঁছাতে পারবে ওরা। এয়ার লকটা অ্যাবির গায়ের এক পাশে।

'কী করবে, রানা?' ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল সুরাইয়া। 'তুমি জানো ভেতরে কী আছে।'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এখানে থাকার মানে নির্ঘাত মৃত্যু। ভেতরে আলো আছে, অক্সিজেন আছে...আছে লড়াই করার সুযোগ। এখানে আমরা অসহায় শিকার মাত্র।'

একটা ঢোক গিলে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া।

হ্যাচ গলে সাবধানে স্পেস লক-এ ভেসে এল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ভারী আর মোটা আউটার ডোর বন্ধ হয়ে গেল, আড়ালে বসানো ভালব থেকে হিসহিস শব্দে বাতাস ঢুকছে।

রানার হেলমেটে বাষ্প জমছে। সময় মত সেটা মুছে ফেলায় দেখতে পেল ইনার ডোর খুলে যাচ্ছে। তিনজন ইজরায়েলি ঘিরে ধরল ওদেরকে, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

অস্ত্র নেড়ে নির্দেশ দিল তারা। বলতেই হবে যে ভাগ্য সহায়তা করছে। তা না হলে দেখামাত্র গুলি করে মেরে ফেললে কিছুই ওদের করবার ছিল না। বোকামি হোক বা যাই হোক, ওয়ালথারের শেষ বুলেটটাও রানা খরচ করে ফেলেছে। আর সুরাইয়ার কাছে কোন অস্ত্রই নেই।

ধীরে ধীরে এয়ার লক ত্যাগ করল ওরা। বাইরে বেরিয়ে স্পেস সুট খুলতে হলো। ভাগ্যিস নিজেদের পোশাকের উপরে এগুলো পরেছিল, তা না হলে নির্দেশ মানতে গিয়ে দিগম্বর সাজতে হত।

'ওদেরকে মেরে ফেলা উচিত,' একজন অ্যাস্ট্রনট প্রায় খেঁকিয়ে উঠবার ভঙ্গিতে বলল। তার কাঠামোটা প্রকাণ্ড।

'আদেশ,' আরেকজন বলল, 'নিহান।' এই লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'মেজর বারাইদিকে তুমি চেনো, প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে ভীষণ মাইন্ড করেন।'

'মেজর বারাইদি মাটিতে রয়েছেন, এখানে নন। এয়ার লক থেকে ওদেরকে আমরা ফেলে দিতে পারি। বলব জুবিলি থেকে ট্রান্সফার হতে ব্যর্থ হয়েছে। জানছেটা কে?'

'উনি ঠিকই জানবেন। মনের কথা পড়তে পারেন।'

ইজরায়েলিরা ওদের ভাগ্য নিয়ে তর্ক করছে, এই ফাঁকে মাথা ঘুরিয়ে স্পেস স্টেশন অ্যাবির ভিতরটা দেখছে রানা। যতটা ধারণা করেছিল, জায়গাটা তারচেয়েও বড়। ইজরায়েলিরা তাদের স্পেস স্টেশনে কাঠ আর অ্যালুমিনিয়ামই বেশি ব্যবহার করেছে, প্লাস্টিকের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

পৃথিবীর দিকে তাক করা টেলিস্কোপটা খুব দামী মনে হলো, সম্ভবত জার্মানির তৈরি। বৃত্তাকার দেয়াল জুড়ে সারি সারি কমপিউটার বসানো রয়েছে। প্রচুর ইকুইপমেন্ট দেখা গেল, বেশিরভাগই আগে কখনও দেখেনি রানা।

ইজরায়েলিদের দিকে চোখ ফেরাল ও। তৃতীয় লোকটা ছোটখাট, মাথার সামনের অংশে বেশ বড় টাক।

ওদের লিডারের নাম বেন মেনিন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শক্ত-সমর্থ গড়ন। স্টেশনে রানা আর সুরাইয়ার উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন সে। খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না তাকে। মাটির পৃথিবী থেকে একশো বিশ মাইল উপরে অনিমন্ত্রিত অতিথি কেউই আশা

করে না।

সব বুলেট খরচ করে ফেলায় আবার নিজেকে তিরস্কার করল রানা। জায়গামত একটা গুলি লাগাতে পারলে স্পেস স্টেশন ডিকমপ্রেস হয়ে যেত, ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত সবাই।

চিন্তাটা রানার মাথায় ছুটোছুটি করছে, তবে একেবারে চলে যাচ্ছে না। ইজরায়েলিদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র রয়েছে। স্রেফ ভয় দেখানোর জন্য? ওরাও তো জানে স্টেশনের ভিতর গুলি হলে মৃত্যু অনিবার্য।

অর্থাৎ আসলে ওরা গুলি করবে না।

স্টেশনের দেয়াল আর মেঝের মাঝখানে পা বাধিয়ে ঠিক সময় মত লাফটা দিল রানা। প্রকাণ্ডদেহী নিহান মন্থরগতিতে ভেসে সবেমাত্র ওর 'উপরে' পৌঁছেছে, ঠিক তখন। লোকটার কব্জি চেপে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে মোচড়াল।

ওজনহীনতার কারণে আচরণটা হাস্যকর হয়ে উঠল। নিজেকে অনায়াসে ছাড়িয়ে নিল নিহান, তার ধাক্কা খেয়ে নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকল না রানার।

নিহান কয়েক মাস ধরে এই পরিবেশে বাস করছে, কাজেই তার নড়াচড়ায় অসঙ্গতি প্রায় নেই বললেই চলে। রানাকে ধরে শূন্যে স্থির করল সে।

'শালা মুসলমান!' খেঁকিয়ে উঠল, হাতের আগ্নেয়াস্ত্র তাক করল সরাসরি রানার বুকে।

ট্রিগার টেনে দিল নিহান।

তেরো

পিস্তলের গর্জন কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার উপক্রম করল। সুরাইয়ার ভয়ার্ত চিৎকার যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে।

সাধারণ একটা ধারণা হলো, মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে সামনে দিয়ে পার হয়ে যায় তোমার গোটা জীবন। রানার অনুভব আর উপলব্ধিতে সে-সব কিছুই ধরা পড়ল না। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় লাগল ওর, জানে মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য কিছুই করতে পারেনি বা পারছে না।

শত্রুর হাতের ট্রিগারে যখন টান পড়ছে, রানার চিন্তা-চেতনায় তখন শুধু একটা দুঃখ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—রাহাত খান, বিসিআই আর বাংলাদেশকে হতাশ করল ও।

বুলেটটা রানার ঠিক বুকের মাঝখানে লাগল।

ফুসফুস খালি হওয়ার সময় ওর মুখ থেকে হু-উ-উ-উ-স্ করে একটা আওয়াজ বেরুল। শরীরটা অবিরাম ডিগবাজি খাচ্ছে শূন্যে। দেয়ালে একটা ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে এল কামরার মাঝখানে।

'রাবার বুলেট,' বলল নিহান। 'স্টেশন ফুটো করার ঝুঁকি আমরা নিই না।'

রানা এমন হাঁপাচ্ছে যে কথা বলা কঠিন। বুকে জ্বালা অনুভব করছে ও, নিশ্চয়ই চামড়া ছিলে গেছে। ইচ্ছে হলো ওদের লিডারকে জিজ্ঞেস করে আসল বুলেটগুলো কোথায় রাখা হয়।

'নিহান,' লিডার মেনিন বলল। 'ওদেরকে তুমি স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে রেখে এসো। ওখানে এমন কিছু নেই যে ক্ষতি করতে পারবে।'

এখনও সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে রানা;

নিহানের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল ও। ঠেলে, গুঁতো মেরে স্টোরেজ কমপার্টমেন্টে ঢোকানো হলো ওকে। পিঠে ধাক্কা খেয়ে সুরাইয়াও ভিতরে ঢুকল।

ভারী ধাতব দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনে। ওরা বন্দি, রায়ও হয়ে গেছে, এখন শুধু মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করবার অপেক্ষা।

'এখানে আমরা দম বন্ধ হয়ে মারা যাব?' জানতে চাইল সুরাইয়া, সাংঘাতিক নার্ভাস। বাঁকা দেয়ালের শেষ প্রান্তে, একটা সাপোর্টিং বিম ধরে ভেসে আছে সে। মুখ থেকে রক্ত নেমে গেছে, ধরে নিয়েছে এই কামরা ছেড়ে জীবিত বেরুতে পারবে না।

'ভয় পেয়ো না, প্রচুর অক্সিজেন আসছে।'

'ওরা যদি সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়? চারদিকে ভালভের তো কোন অভাব নেই। তখন কী হবে?'

'তখন এটা অন করব,' বলল রানা, কাছাকাছি একটা ভালভের দিকে আঙুল তুলল। সাংকেতিক ভাষায় নিশ্চয়ই 'অক্সিজেন' লেখা রয়েছে। সেটা পড়তে না পারলেও, বড় আকৃতির 'O' দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল। ওটা অক্সিজেনের প্রতীকচিহ্ন। 'এটা খুললেই হু হু করে অক্সিজেন পাব আমরা।'

ধীরে ধীরে সাহস ফিরে পাচ্ছে সুরাইয়া। রানার কাছাকাছি চলে এল।

'নিজেদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না,' এক সময় রানাকে বলল সে। 'অথচ হয়তো একই কাজ করতে গিয়ে একসঙ্গে মারা যাব আমরা।'

'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে কে কে আছে তোমার?'

'কেউ নেই, আমি একা।'

'কী আশ্চর্য! সত্যি? আরে, আমিও তো!'

সুরাইয়ার একটা হাত ধরল রানা। সুরাইয়া সেটা ছাড়িয়ে নিল

না। একজনের নিঃশ্বাস আরেকজনকে স্পর্শ করছে, এত কাছে চলে এল ওরা।

অনেকক্ষণ ধরে গল্প করল দু'জন। বিপদের কথা ভুলে কৌতুক শুনে হাসল। কপট রাগে সুরাইয়া ঠোঁট ফোলাল তো খোঁচা খেয়ে গম্ভীর হলো রানা।

এভাবে শুধু ঘনিষ্ঠতাই বাড়ল। তারপর পরস্পরকে ছুঁলো ওরা। ছোঁয়ার পর কেউ কাউকে ছাড়ল না।

*

তৃপ্ত এবং ক্লান্ত সুরাইয়া বেশ কিছুক্ষণ হলো রানার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রানার চোখে ঘুম নেই। মাথায় একটাই চিন্তা—কীভাবে এখান থেকে বেরুনো যায়, বেরিয়ে ইজরায়েলি ষড়যন্ত্র থেকে দেড়শো কোটি মানুষকে বাঁচাতে পারে।

মগজের গভীর কোন প্রদেশ থেকে একটা আইডিয়া উপরে উঠে আসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। ব্যাপারটার সঙ্গে যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাব কিংবা ওজনহীনতার সম্পর্ক আছে।

অবশেষে মাথা নাড়ল রানা। আইডিয়াটার তাৎপর্য যাই হোক, এখনই সেটা বেরুবে না।

তবে অন্য একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ওরা একটা স্টোররুমে আটকা পড়েছে। এবং সেই স্টোররুমে অন্তত একটা অক্সিজেন ভালভ আছে।

'সুরাইয়া,' ডাকল রানা, হাত ধরে ঝাঁকাল। 'বোতলগুলোয় কী আছে বলো তো?'

সিধে হলো সুরাইয়া, হাত দিয়ে চোখ রগড়ে বোতলগুলো চেক করল। 'কার্বন ডাইঅক্সাইড। গায়ে লেখা "ফর এক্সটার্নাল ইউজ ওনলি"।'

'অ্যাবির বাইরে কাজ করার সময় CO_2-এর প্রবাহকে ব্যবহার করে ওরা,' বলল রানা। মাথার ভিতর ঝড় বইছে।

গ্যাসটা বিষাক্ত নয়, তবে কৌশলে ব্যবহার করতে পারলে নিজেদেরকে মুক্ত করা সম্ভব।

'কী করছ তুমি, রানা?'

জবাব না দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা বোতল কামরার আরেক প্রান্তে বয়ে নিয়ে এল রানা, যেখানে অক্সিজেন ভালভটা রয়েছে। 'চিন্তা কোরো না,' বলল ও। 'কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে যাব এখান থেকে।'

গ্যাস সিলিন্ডারটা অক্সিজেন লাইনের সঙ্গে ফিট করল রানা, তারপর বটলের ভালভ পুরোপুরি খুলে দিল। হিসহিস আওয়াজ তুলে গ্যাস বেরুচ্ছে।

বগলের পাশে, স্ট্র্যাপ দিয়ে হাতের সঙ্গে বাঁধা ছুরিটা রানার মুঠোয় চলে এল। জানে, ওকে অত্যন্ত সাবধানে নড়াচড়া করতে হবে। ওজন না থাকায় নিজের দ্বারা ছুরিকাহত হওয়ারও আশঙ্কা আছে।

'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না। CO_2 বিষাক্ত নয়। এটা ওদের কোন ক্ষতিই করবে না।'

'ভুল। শুধু একটু ধৈর্য ধরো, তারপর দেখো কী ঘটে।'

এক মিনিটও পার হয়নি, গোটা স্টেশনে অ্যালার্ম বেল বেজে উঠল। স্টোরেজ রুমে নিহানই সবার আগে মাথা গলাল। সবার আগে মরতেও হলো তাকে। রানার ছুরি তার গলা কাটল, চিবুকের নীচেটা ছুঁয়ে স্যাৎ করে বেরিয়ে গেল চকচকে ফলাটা।

বাইরে রক্ত বেরুল অদ্ভুত এক ধরনে। তরল রক্ত দ্রুত খুদে ফোঁটায় পরিণত হলো, একরাশ লাল বেলুনের মত ভেসে থাকল মৃত অ্যাস্ট্রনটের গলার চারপাশে।

লাশটা হালকাভাবে বাড়ি খেল দরজার গায়ে। লাথি মেরে সেটাকে স্টেশনের মূল অংশে ফেরত পাঠাল রানা।

'নিহান, কী ব্যাপার–' মেনিন মাঝপথে থেমে গেল, রানা আর সুরাইয়াকে স্টোরেজ রুম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখছে। ছুরির

ব্লেড নিঃসঙ্গ নয়, চারপাশে ছোট একটা লাল মেঘ বহন করছে। এ-সব দেখে যা বুঝবার বুঝে নিল মেনিন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

পিস্তল বের করে লক্ষ্যস্থির করল মেনিন। তার এই রিফ্লেক্স মর্ত্যলোকে হয়তো সুফল বয়ে আনত, কিন্তু এখানে উল্টোটা ঘটল। নিজেকে কিছুর সঙ্গে না আটকে গুলি করল সে। ডিগবাজি খেয়ে পিছু হটল শরীরটা, নিতম্ব গিয়ে পড়ল একটা চায়ের কেটলিতে। রাবার বুলেটটা কামরার ভিতর খুদে একটা উল্কার মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

মেনিন আপাতত অচল, এই ফাঁকে তৃতীয় লোকটাকে খুঁজছে রানা। কপালের উপর বিরাট টাকটাকে দেখা গেল একটা থাম-এর আড়ালে। লোকটা ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে, অস্ত্রটা ঘুরিয়ে এদিকে তাক করতে যাচ্ছে।

ঝট করে ছুঁড়ে দিলে ছুরিটা তাকে কাবু করতে পারবে কি না ভাবল রানা। চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। ছুটে যাওয়ার সময় মাধ্যাকর্ষণের অভাবে ঠিকমত ওটা ডিগবাজি খাবে না। এ-ধরনের লড়াইয়ে এখনও রানা নবাগত।

পা দুটো সবেগে ছুঁড়ে, বিরাট কমন রুমের উপর দিয়ে রকেটের মত উড়ে এল রানা, ছুরি ধরা হাতটা নিজের সামনে লম্বা করে রেখেছে। এটাই ওর হামলা–নিজেকে বর্শা বানিয়ে ফেলেছে। টেকো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সময়ের আগে তার হাতে ঝাঁকি খেল পিস্তলটা। থামের সঙ্গে শক্তভাবেই নিজেকে আটকে রেখেছিল সে, কিন্তু পিস্তল ধরা মুঠোটা নিশ্চয়ই কিছুটা আলগা ছিল–হাত থেকে বেরিয়ে কমন রুমের আরেক দিকে ছুটে গেল সেটা।

বর্শার ডগা সরাসরি বাম বুকে গ্রহণ করল লোকটা।

'রানা, আরেক বেজন্মা!' চেঁচিয়ে সতর্ক করল সুরাইয়া। এতক্ষণ হাতের কাছে আলগা যা পেয়েছে তাই মেনিনকে লক্ষ্য

করে ছুঁড়েছে সে, কোন লাভ হয়নি। মোশান বা গতি সম্পর্কে নিউটনের সেকেন্ড ল বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে তাকে। সে এখনও উপলব্ধি করতে পারছে না যে এক দিকে সামান্যতম নড়াচড়ার ফলে উল্টোদিকেও সমান রিয়্যাকশন হবে। যেমন–সুরাইয়া যখন ভারী একটা বই ছুঁড়ল, একই গতিতে সে নিজেও পিছিয়ে গেল।

কামরার মাঝখানে মেনিন আর রানা মুখোমুখি হয়েছে। মুখে ক্ষীণ হাসির অর্থ, মেনিন ভাবছে সে-ই জিতবে। রানাকে প্রমাণ করতে হবে তার ধারণা ভুল।

সময় কিন্তু রানার বিরুদ্ধে। লড়াইটা যত দীর্ঘ হবে, ওজনশূন্য পরিবেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা তত বেশি ভুল করাবে ওকে দিয়ে।

রানার মাথাকে পাশ কাটাচ্ছে একটা পেনসিল। খপ করে ধরল সেটা, খুদে বর্শার মত করে ছুঁড়ে দিল মেনিনের দিকে।

বাঁ চোখের মণি বাঁচাবার জন্য মাথাটা দ্রুত একপাশে সরিয়ে নিল মেনিন, ধাতব থামে ঠকাস করে ঠুকে গেল খুলিটা। শূন্যে উঠে গেল সে।

রানা যেন ঠিক এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিল। পা দুটো তুলে আঙটা বানাল, পেঁচিয়ে ধরল মেনিনের গলা। ভালভাবে আটকে নিয়ে টান দিল, মেনিনের শরীর অ্যাবির গায়ে প্রচণ্ড বেগে বাড়ি খেল।

এক আছাড়েই অজ্ঞান।

'ওকে তুমি স্টোরেজ রুমে ঢোকাও,' সুরাইয়াকে নির্দেশ দিল রানা। এগিয়ে এসে টেকোকে পরীক্ষা করল ও। না, লোকটা বেঁচে নেই।

কামরার মাঝখানে এসে থামল রানা। ইজরায়েলিদের স্পেস স্টেশন অ্যাবি এখন ওর দখলে। মিশন সফল করবার সময় এখন: কাঁচের ডিশটা ধ্বংস করতে হবে।

‘বাইরে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ম্যাগনিফাইং গ্লাসের অতবড় ডিশটা কী ধ্বংস করা সম্ভব? কী দিয়ে?’ রানার তাগাদা পেয়ে স্পেস সুট পরবার সময় জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

‘ওটা আগে কাছ থেকে পরীক্ষা করতে হবে, তারপর বলতে পারব। আমার কাছে কয়েকটা জেলিগনাইটের স্টিক আছে। কিন্তু ওগুলো দিয়ে তিন মাইল ডিশের সিকি মাইলেরও ক্ষতি করা যাবে না।’

‘যাই করি, খুব সাবধানে কিন্তু,’ সতর্ক করল সুরাইয়া। ‘একটু ভুল হলেই মহাশূন্যে ভেসে যাব।’ হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। ‘বাইরে বেরিয়ে আমরা আসা-যাওয়া করব কী ভাবে?’

‘ CO_2-র জেট ব্যবহার করব, ইজরায়েলিরা যেমন করত। চলো, এয়ার লক-এ ঢুকি।’

ছোট্ট লকের ভিতর ঢুকে সাইক্লিং শুরু করল ওরা—পাম্প করে অ্যাটমসফিয়ার বের করা হচ্ছে। প্রেশার যথেষ্ট কমে যাওয়ার আগে আউটার ডোর খুলল না। বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত আর অসীমের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছানোর অনুভূতি গ্রাস করল রানাকে। যতক্ষণ স্পেস স্টেশন অ্যাবি চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছিল ওকে, দূরত্ব আর বিশালত্ব সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। এখন হলো।

ওর নীচে ঝুলে আছে পৃথিবী, উজ্জ্বল নীল আর চকলেট রঙের একটা বল, মোম লাগানো কাগজের মত মেঘে মেঘে ঢাকা।

আর মাথার উপর ধূলি ঝড়; প্রতিটি ধূলিকণা একেকটা নক্ষত্র। এত উজ্জ্বল তারা আগে কখনও দেখেনি রানা।

কাছাকাছি একটা রিঙ-এ সেফটি লাইন আটকে এয়ার লক থেকে বেরিয়ে এল ও। এই প্রথম, এত কাছ থেকে, জিনিসটাকে দেখল।

সোলার গ্লাস।

জাল বা ডিশটা বড়, জানত রানা। তবে এবারই সবটুকু

একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান, তিন মাইলের বেশি হবে তো কম নয়। সন্দেহ নেই এটা একটা বিস্ময়কর ইঞ্জিনিয়ারিং। আধুনিক প্রযুক্তির এরকম একটা আবিষ্কার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু জিনিসটা তৈরিই করা হয়েছে মানুষের ক্ষতি করবার জন্য—কাজেই এটাকে ভাঙতেই হবে।

ঝাঁক-ঝাঁক উজ্জ্বল তারা মাথার চারদিকে চক্কর দিচ্ছে, আর ওদের নীচে ধীরে ধীরে ঘুরছে পৃথিবী—দু'দিক থেকেই চোখ ফেরানো কঠিন মনে হলো।

পৃথিবীর দিকটাকে 'নীচে' ভাববার কোন যুক্তি নেই, যদিও সেভাবেই চিন্তা করতে অভ্যস্ত ও। তবে এখানে এসে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, পৃথিবী যেমন নীচে নয়, তেমনি তারাগুলোয় নয় উপরে।

দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য স্পেস স্টেশন অ্যাবি স্থির একটা চিহ্ন হিসাবে সাহায্য করছে ওকে।

'রানা, ওটা কীভাবে তুমি অকেজো করবে?' সোলার ডিশটার দিকে হাত তুলল সুরাইয়া। স্পেস স্টেশনের কোণ থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওটাকে।

প্রকাণ্ড থালা আকৃতির জ্বলন্ত সূর্যটা এক পলক দেখে নিয়ে পিয়ানো ওয়ায়্যার দিয়ে বাঁধা ম্যাগনিফাইং গ্লাসগুলোর দিকে তাকাল রানা। গোটা ডিশ পৃথিবীর দিকে তাক করা। নীচে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল, বহু গুণ উত্তপ্ত করা রোদ পৃথিবীর ঠিক কোথায় পাঠানো হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগর চিনতে পারল রানা, চিনতে পারল হিমালয় আর চীনের প্রাচীর।

তারপর শিউরে উঠল ও। সোলার গ্লাস এই মুহূর্তে তাক করা রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দিকে। অর্থাৎ ওদের ইচ্ছে ছিল, এবার ঢাকায় জ্বলবে আগুন।

গ্লাভসের ভিতর মুঠো হয়ে গেল রানার হাত।

'রানা! কী হলো তোমার?' কাঁধে সুরাইয়ার স্পর্শ পেল রানা। 'তোমাকে আমার হিপনোটাইজড্ মনে হচ্ছে।'

'ও কিছু না। ওই কাঁচগুলো ভাঙতে হবে। এখনই।'

'ওটাকে তুমি স্রেফ ঠেলে সরিয়ে দিলেই তো পারো,' বুদ্ধি দিল সুরাইয়া। 'ওটার তো তেমন কিছু ওজন নেই।'

আইডিয়াটা মন্দ নয়! সুরাইয়া সত্যি কথাই বলেছে। কক্ষপথে থাকবার সময় গ্লাসগুলোর কোন ওজন নেই।

'চেষ্টা করে দেখা যায়। তুমি আমাকে ম্যানুভারিং জেটটা দাও।'

রানার হাতে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বটল্ ধরিয়ে দিল সুরাইয়া, গায়ে আটকানো একজোড়া জেট। চিমনি আকৃতির নজল্ পরস্পরের উল্টোদিকে তাক করা। এক ঝলক কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করতে চাইলে জোড়া ট্রিগারে টান দিতে হবে। ও যদি সরাসরি সামনে যেতে চায়, দুটো ট্রিগারকে একই মাত্রায় পিছিয়ে আনতে হবে। কোন দিকে বাঁক নিতে চাইলে, সেদিকেরই ট্রিগার উপরে তুলতে হবে। কোন একটা জেট যদি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে যাবে রানা। কিংবা, সঠিক মুহূর্তে ট্রিগারটা অফ না করলে, ঘুরতেই থাকবে ও। পানির মত সহজ।

তবে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগছে।

প্রথমবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘন ঘন ডিগবাজি খেল রানা, যেন সার্কাসের একজন অ্যাক্রোব্যাট। সাবধানতার মার নেই, তাই আগেই স্পেস স্টেশনের গায়ে আটকানো একটা রিঙে সেফটি লাইনটা শক্ত করে বেঁধে রেখে এসেছে।

নাইলন লাইনের শেষ মাথায় পৌঁছাতে কঠিন একটা টান অনুভব করল, থামল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসতে শুরু করল লাইনের পথ ধরে।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করল রানা, তারপর নরম হাতে ট্রিগারে টান দিল অন্যদিকে ফিরবার জন্য।

রহস্যটা হলো, প্রতিবার সামান্য একটু গ্যাস রিলিজ করলেই আকাঙ্ক্ষিত গতি পাওয়া যায়, অবিচ্ছিন্ন ধারার কোন প্রয়োজন নেই।

রানার রেডিও জ্যান্ত হয়ে উঠল, শোনা গেল সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর। 'ধরা দিতে না চাওয়া মাছের মত অস্থির লাগছে তোমাকে।' হেসে উঠল সে। 'লাইন গুটিয়ে টেনে নেব জনাবকে?'

'আরেকটু প্র্যাকটিস করতে দাও,' বলল রানা। 'এই বোতলটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। ব্যাক আপ রেখেছ তো?'

'স্টোর রুমে যতগুলো ছিল সব এখানে নিয়ে এসে রেখেছি,' আশ্বস্ত করল সুরাইয়া, খোলা এয়ার লকের মুখে সাজানো খুদে বোতলগুলো ইঙ্গিতে দেখাল।

আরও পাঁচ মিনিট প্র্যাকটিস করবার পর রানা বলল, 'এবার ডিশটার কাছে যাব আমি।'

'ভাল করে ভেবে দেখো। ওটা কিন্তু...কিন্তু অনেক দূরে। তা ছাড়া, সেফটি লাইন ছাড়াই যেতে হবে তোমাকে। কোন ভুল হলে শুধরাবার সুযোগ পাবে না, চিরকালের জন্যে ভেসে যাবে মহাশূন্যে।'

'ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়,' বলল রানা। 'পৃথিবীর অরবিট বা কক্ষপথ ছেড়ে যাবার মত যথেষ্ট গতি আমি পাব না।' তবে এ-কথা আর বলল না যে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা একটা স্যাটেলাইটে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে বটে। কিংবা, যদি কক্ষপথ ধরতে বা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, অ্যাটমসফিয়ারে পতন ঘটবে ওর, উল্কা খসে পড়বার রাত্রিকালীন দৃশ্যের অংশবিশেষে পরিণত হবে।

'মোটকথা যা করবে বুঝেশুনে কোরো,' রেডিওতে বলল

সুরাইয়া। 'তোমার কিছু হলে আমি একা হয়ে যাব। আর...এটা পৃথিবী নয়।'

'আমি বললে সেফটি লাইন টেনে নেবে তুমি,' নির্দেশ দিল রানা। 'প্রথমে লাইনের শেষ মাথা পর্যন্ত যাব, পজিশন নেব, তারপর তুমি ছেড়ে দিলে জেট ব্যবহার করে রওনা হব। ঠিক আছে?'

'আমার নার্ভাস লাগছে, রানা। যা করার তাড়াতাড়ি করো।'

রানা আরও বেশি নার্ভাস। নিজেকে নিয়ে স্রেফ একটা জুয়া খেলছে ও। তবে এর কোন বিকল্প নেই।

সামান্য এক ঝলক কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরুতেই সেফটি লাইন টান টান হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ঘুরল ও, ম্যানুভারিং জেট-এর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করল, তারপর শরীরটাকে পুরোপুরি স্থির রেখে তাকাল দূরে—ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তৈরি ডিশটার দিকে। ওটা বিশাল।

'লাইন টেনে নাও।'

'সাবধানে, রানা।'

দুটো ট্রিগারই পিছন দিকে টেনে ধরল রানা। যেদিকে যেতে চাইছে সেদিকে সাবলীল গতিতে এগোল শরীরটা। বাহ্, কী মজা, এতটুকু পরিশ্রম করতে হচ্ছে না!

কোর্স ঠিক আছে, নিশ্চিত হওয়ার পর CO_2-র মৃদু প্রবাহ বন্ধ করে দিল রানা।

তবে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা ওর কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ছুটিয়ে দিল। ডিশটা এখনও কাছে চলে এসেছে বলে মনে হচ্ছে না, অথচ স্পেস স্টেশন অ্যাবি ভীতিকর গতিতে ক্রমশ পিছিয়ে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপরও সাহসে বুক বেঁধে নিজের কোর্স ধরে এগোচ্ছে রানা।

ধীরে ধীরে, একটু একটু করে আকারে বড় হতে লাগল

মাকড়সার জালটা। ইতিমধ্যে স্পেস স্টেশন অ্যাবি স্রেফ একটা বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, রোদ প্রতিফলিত হওয়ায় জ্বলজ্বল করছে বিন্দুটা। বিস্মিত হয়ে রানা ভাবল, কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে ও? যেতেই বা হবে আর কত দূর? রেফারেন্স পয়েন্ট না থাকায় সময় আর দূরত্বের কোন হিসাব পাওয়া কঠিন এখানে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড বোতলের নজল ঘুরিয়ে দুটো ট্রিগারই টানল রানা। ওর এগোবার গতি কমে গেল। প্রকাণ্ড ডিশটা আগের চেয়েও ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

রানা ওটাকে ছাড়িয়ে যেতে চায় না। যদিও জানে যে সুরাইয়ার ভয় অমূলক, তবু মহাশূন্যে ভেসে যাওয়ার চিন্তাটা মোটেও স্বস্তিকর লাগছে না।

ওর বুলেট আর ডেটোনেটর খুব সামান্যই ক্ষতি করতে পেরেছে কাঁচগুলোর। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বুলেট লাগায় সেটা মাকড়সার জাল হয়ে গেছে। অপর একটা গ্লাস ভেঙে গেলেও, পিয়ানো তারের সঙ্গে ঝুলে আছে টুকরোগুলো।

হঠাৎ একটা বিপদের কথা খেলল রানার মাথায়। রোদ! সূর্যের আলো! ম্যাগনিফাইং গ্লাসে লেগে রশ্মিগুলো কোন পথ বা কোণ ধরে পৃথিবীর দিকে ছুটছে, ওর জানা নেই। আকৃতি বা কাঠামোটার সামনে ঠিক কোথায় প্রতিফলিত রোদ জড়ো হচ্ছে বা ঘনীভূত হচ্ছে তাই বা কে জানে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটছে তো বটেই। এই অদৃশ্য রশ্মির কারণে লোহা আর ইস্পাত তরল মাখনের মত গড়িয়ে যায় পৃথিবীর বুকে। আর ধীর গতিতে সম্ভবত ঠিক সেই ফোকাল পয়েন্টের দিকেই এগোচ্ছে ও।

উন্মত্তের মত খুঁজছে রানা—ফোকাল পয়েন্টটা কোথায় হতে পারে। ও শুধু এইটুকু বুঝতে পারছে যে ম্যাগনিফাইং গ্লাসগুলোর সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ওর শরীরটা। এখন যদি ভুল কোন জায়গায় পৌঁছায়, চোখের পলকে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে।

এমনকী ভাগ্যগুণে ফোকাল পয়েন্ট এড়িয়ে যেতে পারলেও,

সোলার গ্লাসের সামনে জড়ো হওয়া থারমাল রেডিয়েশন ওকে পোড়া পোড়া করে ভেজে ফেলতে পারে।

ট্রিগার টেনে ইউ টার্ন নিল রানা, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ডিশটার সামনে থেকে সরে আসতে চাইছে।

'রানা, কথা বলো আমার সঙ্গে। সব ঠিক আছে তো? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে সব—এখন পর্যন্ত,' বলল রানা। 'তুমি জুবিলির ক্যাপসুলে ফিরে গিয়ে আমাকে রেইডারে দেখতে পারো। ডিশের মুখ ঘোরাতে চাই আমি, তুমি রেইডারে ওটার অবস্থান দেখে পরামর্শ দিতে পারো।'

'ঠিক আছে, রানা, তাই যাচ্ছি। জুবিলি এখনও ভিড়ে আছে, কাজেই সেফটি লাইনের সাহায্যে ওটায় পৌঁছাতে পারব আমি।'

'গুড, তাই করো। গ্যাস বটলগুলো কিনারায় আটকে দেখতে চাই ডিশটাকে নড়ানো যায় কিনা।'

'সবগুলো নয়। ফেরার জন্য অন্তত গোটা দুয়েক সঙ্গে রেখো,' সতর্ক করল সুরাইয়া।

'তা তো রাখবই।'

ক্যাপসুলে ফিরে যাচ্ছে সুরাইয়া, ফলে কয়েক মিনিট কথা হলো না।

'রেইডারে তোমার ইমেজ পাচ্ছি, রানা,' খানিক পর আবার তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জুবিলির ভিতর রয়েছে, তাই রেডিও সিগন্যাল আগের চেয়ে দুর্বল। 'কী করছ তুমি?'

'বটলগুলো ডিশের বিমে আটকাচ্ছি।' অতিরিক্ত চারটে বোতল রয়েছে রানার কাছে, প্রতিটি বিশ ফুট দূরত্ব রেখে আটকাল। কয়েক মাইল বিস্তৃত বৃত্তাকার ডিশের তুলনায় অতি তুচ্ছ আর তাৎপর্যহীন মনে হলো ওগুলোকে।

তারপর এক এক করে ট্রিগার টেনে গ্যাসের প্রবাহ মুক্ত করে দিল রানা। ঠাণ্ডা গ্যাস রকেটের বেগে বেরিয়ে এল।

কিছুই ঘটল না। ডিশটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, গ্যাসের প্রবাহ এক চুল নড়াতে পর্যন্ত পারল না ওটাকে।

রানা বুঝতে পারল, একমাত্র সৌর ঝড় ছাড়া এই আকারের একটা ডিশকে নড়ানো সম্ভব নয়। তাতে কয়েক মাস, এমনকী কয়েক বছরও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

এক সময় গ্যাসের প্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়ল, তারপর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

'তুমি ঠিক কী করছ জানি না। কিন্তু রেইডারে আমি কিছুই ঘটতে দেখছি না। তারমানে কি কাজ হয়নি?'

'না।'

'তা হলে? এখন কী করবে তুমি?' রানার হেডফোনে সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর উদ্বিগ্ন শোনাল।

কাটব,' বলল রানা। 'তার কেটে একটা একটা করে আলাদা করতে হবে প্রতিটা কাঁচ।'

'কিন্তু এভাবে কি ওটাকে অকেজো করা সম্ভব?' সুরাইয়ার সুরে সংশয়। 'হাজার হাজার কাঁচ, ক'টাই বা তুমি খুলতে পারবে।'

'দেখি,' বলে ম্যানুভারিং জেট ব্যবহার করে ডিশের কিনারা হয়ে উল্টোদিকে চলে এল রানা। বেল্টে আটকানো লেদার পাউচ থেকে একটা ওয়ায়্যার কাটার বের করে কাজ শুরু করল ও।

চারদিকের তার কেটে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আলাদা করা গেল সহজেই। কিন্তু তার কাটবার পরও কাঁচটা নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না।

মুহূর্তের জন্য বিভ্রান্তিতে পড়ল রানা। তারপর বুঝল এ রকম কেন ঘটছে। ও মহাশূন্যে রয়েছে, এটা খেয়ালের মধ্যে রেখে কাজ করতে রাজি হচ্ছে না ওর মস্তিষ্ক। মাধ্যাকর্ষণ বা বাতাস ছাড়া কাঁচগুলো যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আলগা কাঁচে

হালকা একটা ঠেলা দিল ও। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সেটা—রানা সরল উল্টোদিকে।

আবার ম্যানুভারিং জেট ব্যবহার করে আগের জায়গায় ফিরে এল ও। এবার বুদ্ধি করে প্রতিবার একটা কাঁচের নয়, চার পাঁচটা কাঁচের তার কাটল। তবে এভাবে বিচ্ছিন্ন করলেও ডিশটাকে অকেজো করতে দিনের পর দিন হাড়ভাঙা খাটনি দরকার। ওর হিসাবে, শুধু আউটার রিঙেই তেরো হাজার ম্যাগনিফাইং গ্লাস রয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় একজোড়া গ্লাসের মাঝখানে এক ফুট করে ফাঁক রাখা হয়েছে, তা হলেও প্রায় ত্রিশ লাখ গ্লাস বিচ্ছিন্ন করতে হবে ওকে।

গোপনে সারলেও, কাজটা শেষ করতে ইজরায়েলিদের সময় লেগেছে তিন বছর। সেটাকে ধ্বংস করতে একজোড়া ওয়ায়্যার কাটার যথেষ্ট নয়।

ডিশটার কিনারায় স্থির হয়ে ঝুলে থাকল রানা, হতাশা আর রাগে প্রায় দিশেহারা। জিনিসটাকে ধ্বংস করবার কোন উপায় নেই, এটা মেনে নিতে পারছে না ও। উপায় আবার না থাকে কী করে!

'রানা! রানা, সাড়া দাও। দিস ইজ আর্জেন্ট!'

'কী ব্যাপার, সুরাইয়া?'

'আমি একটা ব্লিপ পাচ্ছি। পৃথিবীর বাঁকের ওদিক থেকে আসছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা স্পেস শিপ হতে পারে।'

বিপদের আভাস পেয়ে রানার তলপেটের ভিতরটায় শিরশির করে উঠল। ওকে বলে দেওয়ার দরকার নেই কে থাকতে পারে ওই স্পেস শিপে।

মেজর এবরান বারাইদি। কৈ মাছের জান লোকটার, মহাশূন্যে উঠে আসছে রানার একটা ব্যবস্থা করতে।

চোদ্দ

'জলদি, রানা, জলদি!' অস্থির হয়ে উঠেছে সুরাইয়া।

কিন্তু ফিরে আসবার গতি মারাত্মক ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত করবার কোন উপায় নেই রানার। কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটাই বোতল রয়েছে ওর কাছে। তাড়াহুড়ো বা অসতর্কতার কারণে ও যদি স্পেস স্টেশন অ্যাবিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়, পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে। ওর এই ফিরে আসবার চেষ্টার মধ্যে কোন ভুল থাকা চলবে না।

নাহ্, এই প্রতিযোগিতায় জেতা সম্ভব নয়। সুরাইয়া যখন সতর্ক করল ওকে, বারাইদির ক্যাপসুলটাকে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে ও। ধীরে ধীরে একটা পেনসিল ইরেজারের আকার পাচ্ছে ওটা। তারপর একটা কয়েন। এক সময় ওটার গায়ের লাল হরফগুলোও দেখতে পেল: শাটল থ্রি স্টার।

রানার দেখবার সুযোগ হয়নি, তবে ও যেভাবে বিস্ফোরক বসিয়ে রেখে এসেছে, ইজরায়েলিদের স্পেস সেন্টার বলতে নাজাফিতে কিছু থাকবার কথা নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই শাটল থ্রি স্টার তা হলে উঠল কোত্থেকে?

এর উত্তর অবশ্য আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। নাজাফি থেকে আইয়াম কতটুকুই বা দূরে, একটা হেলিকপ্টার এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। আগে থেকে সতর্ক করা হলে, একটা শাটলকে মহাশূন্যে নিক্ষেপ করবার প্রস্তুতিও খুব দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। যতই রটানো হোক আইয়ামে এয়ার ফোর্স বেইস তৈরি

করা হয়েছে, আসলে ওটাও একটা স্পেস সেন্টার।

অটোমেটিক ডকিং পদ্ধতি বারাইদিকে সাহায্য করল। জুবিলির পাশে অনায়াসে ভিড়ল তার শাটল থ্রি স্টার।

রেইডার স্ক্রিনে শাটলটাকে দেখবার পর সুরাইয়া কথা বলছে না। বুদ্ধি করে ভাগ্যিস স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে ফিরে যায়নি সে, তা হলে নির্ঘাত বারাইদির হাতে বন্দি হতে হত। জুবিলিতে লুকানোর মানে হলো, স্টেশনের বাইরে থাকছে ওরা, এই পজিশন বারাইদিকে চমকে দেওয়ার বা বোকা বানাবার কাজে লাগতে পারে।

জুবিলির কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, এই সময় বটলের গ্যাস শেষ হয়ে গেল। সেফটি লাইনটা ছুঁড়ে দিল সুরাইয়া, সেটা ধরে ফেলল ও।

লাইন টানছে সুরাইয়া, সেই সঙ্গে নিজের উদ্বেগের কথা জানাচ্ছে রেডিওতে। ইঙ্গিতে চুপ করতে বলল রানা

হ্যাচে, তার পাশে, গুটিসুটি মেরে বসল ও। রেডিও বন্ধ করে কথা বলছে ওরা, ফলে বারাইদি কিছু শুনতে পাবে না।

'কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'স্পেস স্টেশনে ঢুকেছে?'

'ঢুকেছে।' ভয়ে বড় বড় হয়ে আছে সুরাইয়ার চোখ দুটো। 'তার সঙ্গে আরও তিনজন লোক আছে। মেনিনকেও তারা মুক্ত করবে। তারমানে ওদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে আমরা মাত্র দু'জন।'

সংখ্যাটাকে রানা বড় করে দেখছে না। বড় করে দেখছে পজিশনটাকে। শত্রুরা ভাল পজিশনে রয়েছে। অক্সিজেন সহ অন্যান্য সাপ্লাই পাবে না ওরা। বারাইদির কিছু না করলেও চলে, স্পেস স্টেশনে চুপচাপ বসে থাকলেও জিতে যাবে।

নিজের অক্সিজেন লেভেল পরীক্ষা করল রানা। আর ত্রিশ মিনিট চলবার মত অক্সিজেন আছে। সুরাইয়ার হেলমেটের ভিতরটাও পরীক্ষা করল। ইন্ডিকেটর বলছে, তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ

অক্সিজেন আছে তার।

'রানা?' রানার হেডফোনে গাধার ডাকের মত বারাইদির গলা ভেসে এল। 'আমি জানি বিশ্বাসঘাতিনী ডাইনীটার সঙ্গে বাইরে কোথাও আছ তুমি। হার মানো, হে। ধরা দাও।'

সুরাইয়া মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে মাথা নাড়ল রানা।

'কোথায় তুমি, রানা? জানি বেশি দূরে কোথাও নও। সোলার ডিশে নড়াচড়া ধরা পড়েছে। আমাদের স্ট্রেইন গজ-এ দেখা যাচ্ছে, একটা অংশকে ডিসটার্ব করা হয়েছে। ও কিছু না, রানা। কুখ্যাত এমআর নাইন ব্যর্থ হয়েছে। তবে পরম শত্রুও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছে, একমাত্র তুমি বলেই এতদূর আসতে পেরেছ।

'হেরে গেছ তো কী হয়েছে, গোটা একটা সেনাবাহিনীকে পরাজিত করবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারো তুমি। তবে এবার তোমাকে সারেন্ডার করতে হবে। কথা দিচ্ছি, প্রাণপণ চেষ্টা করব তোমাকে যাতে ক্ষমা করে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়া হয়।'

'কী করতে চাইছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া। ওদের হেলমেট জোড়া পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে। রেডিওর সাহায্য নিচ্ছে না, তাই কথা বলতে হচ্ছে চিৎকার করে।

'প্রথম গুরুত্ব মিশনের,' বলল রানা। 'আগে সেলের ডিশটা ধ্বংস করতে হবে। তা করতে গিয়ে যদি মারা পড়ি, পড়লাম।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত,' বলল সুরাইয়া। 'কারণ মুখে যাই বলুক বারাইদি কখনোই আমাদেরকে প্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেবে না। কিন্তু অত বড় একটা কাঁচের ডিশ তুমি ধ্বংস করবে কীভাবে?'

রানা কথা না বলে চিন্তা করছে: প্রচুর বিস্ফোরক থাকলে কাজটা করা যেত। ছোটখাট বিস্ফোরণের সাহায্যে এই প্রকাণ্ড জালের বড় কোন ক্ষতি করা সম্ভব নয়। কাজ হবে শুধু জালের ঠিক মাঝখানটায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে।

জুবিলির কথা ভাবল রানা। খেয়াযানের বেশির ভাগ ফুয়েল

খরচ হয়নি।

কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্য একজোড়া বুস্টার থেকেই পাওয়া গেছে বেশির ভাগ পাওয়ার সাপ্লাই। জুবিলির ফুয়েল ট্যাংক বলতে গেলে প্রায় ভর্তিই।

লিকুইড অক্সিজেন। হাইড্রোজিন। দুটো হলে মারাত্মক বিস্ফোরক। হয়তো অ্যাটমিক বোমার মত ভয়ঙ্কর নয়, তবে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তিন মাইল একটা কাঁচের ডিশ নিশ্চয়ই গুঁড়িয়ে দেবে।

'ফুয়েল লাইনগুলো বাইরে বের করতে হবে,' সুরাইয়াকে বলল রানা। 'তোমার সাহায্য দরকার। তাড়াতাড়ি! বারাইদি আমাদের খুঁজতে বেরুবার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে চাই।'

'তোমার প্ল্যানটা কী বলো তো?'

রানা জবাব দেওয়ার ঝামেলায় গেল না। এক ধরনের জুয়া খেলতে যাচ্ছে ও। হাতে আর কোন বিকল্প নেই।

ভাগ্য সামান্য হলেও অনুকূলে। ফুয়েল লাইনগুলো তামার তৈরি, রুশ বা মার্কিন ক্যাপসুলে ব্যবহার করা হয় স্টেইনলেস স্টিলের। তামার হওয়ায় বাঁকিয়ে নতুন আকৃতি দিতে কোন সমস্যা হলো না। লাইনগুলো বাইরে বের করে এনে স্পেস ক্যাপসুলের গায়ে জড়াল রানা।

'রানা, এখনও সময় আছে, ধরা দাও,' রেডিওতে হুংকার ছাড়ল মোসাদ এজেন্ট। 'এতক্ষণে তোমার অক্সিজেন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেজর মেনিনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। স্টক-এর হিসাব নিয়েছে সে।

'ভুল করে সবগুলোই কার্বন ডাইঅক্সাইডের বোতল নিয়ে গেছ তোমরা, একটাও অক্সিজেনের বোতল নাওনি। আর কতক্ষণ শ্বাস নিতে পারবে? দশ মিনিট? পাঁচ?

'আমি জানি, তোমরা ঘামছ। বাতাস ভারী লাগছে। এগুলোই লক্ষণ–তোমাদের অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে। একটু পর আচ্ছন্ন

বোধ করবে। ধরা দাও, রানা। ভেতরে এসে আয়েশ করে খাওয়া দাওয়া করো, শ্বাস নাও, ঘুমাও!'

'রানা...'

'না, সুরাইয়া, বারাইদি স্রেফ ভয় দেখাতে চাইছে। কাজটা শেষ করবার মত যথেষ্ট অক্সিজেন আছে আমাদের কাছে। চিন্তা কোরো না...'

মুখে কথা বেধে যাচ্ছে। ব্যবহারযোগ্য অক্সিজেনের যে সাপ্লাই পাবে রানা তা দিয়ে আর পাঁচ মিনিটও চলবে না ওর। একটু পরই ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাবে। সুটের ভিতর দ্রুত বাড়ছে তাপমাত্রা। তবে সমস্ত অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরও পাঁচ মিনিট টিকে থাকবে ও। না কি তিন মিনিট? ওর জানা নেই।

'সব লাইন এখন বাইরে, রানা,' বলল সুরাইয়া। 'কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।'

'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে, এসো, আরও সাহায্য লাগবে–জুবিলিকে আমি অ্যাবি থেকে বের করে আনতে চাই।'

ডকিং-এ যেমন কোন সমস্যা হয়নি, আনডকিং-এও হলো না। স্পেস স্টেশন অ্যাবির ভিতরকার কন্ট্রোলের উপর বারাইদির লোকেরা হয় নজর রাখছে না, কিংবা নজর রাখলেও সিস্টেমের মধ্যে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল বাতিল করার উপায় রাখা হয়নি।

ফুয়েল লাইন খুঁজে বের করবার জন্য কন্ট্রোল প্যানেলের তলায় ঢুকতে হয়েছিল রানাকে, তখনই ওর দেখবার সুযোগ হয়েছে ক্যাপসুলের ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে। একটা সেফটি লাইন নিয়ে ক্যাপসুলের হ্যাচের ভিতর নামল ও।

ইঞ্জিনটাকে আধ সেকেন্ডের জন্য স্টার্ট দিতেই স্পেস স্টেশন থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল জুবিলি। আরও আধ সেকেন্ডে ওটাকে তাক করা হলো ডিশটার মধ্যবিন্দু বরাবর।

'রানা,' রেডিওতে আবার শোনা গেল বারাইদির কণ্ঠস্বর,

এবার খানিকটা উদ্বিগ্ন। 'তুমি বোকামি করছ। কোনভাবেই তোমরা আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। আমরা জুবিলির কন্ট্রোল নিজেদের হাতে তুলে নেব—ক্র্যাশ করাব ওটাকে। ধরা দাও। সারেন্ডার। এখনই!'

রেডিওর ভলিউম যতটা পারা যায় বাড়িয়ে দিয়ে রানা বলল, 'তোমার জন্যে দুঃসংবাদ, বারাইদি। সোলার ডিশটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি আমি। কোনভাবেই ঠেকাতে পারছ না।'

'কেন তুমি বোকামি করবে, রানা? কেন? সুইসাইড করা তোমার স্টাইল নয়। তুমি একজন প্রফেশনাল। নিয়ম কানুন সবই তোমার জানা। আমরা দু'জন একই খেলায় আছি। পরস্পরকে আমরা সমীহ করি।

'এ-কাজ কোরো না, রানা। ফালতু জিদ বজায় রাখতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে খুইয়ো না—'

'ফালতু জিদ, না?' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ক্যাপসুলের রকেটগুলো অন করল ও। প্রকাণ্ড স্পেস ক্রাফট ধীরে ধীরে রওনা হয়ে যেতে স্পেস স্টেশনে আটকানো সেফটি লাইন টান টান হয়ে উঠল, রানা আর সুরাইয়াকে ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল ক্যাপসুলের হ্যাচ থেকে।

জুবিলির গতি ক্রমশ বাড়ছে, গন্তব্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড ডিশটার মধ্যভাগ; এদিকে পিছনে পড়ে থাকল ওরা, এখনও স্পেস স্টেশনের গায়ের সঙ্গে বাঁধা।

'রানা!'

'ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, বারাইদি,' বলল রানা। রেডিওর ভলিউম কমিয়ে ফেলেছে ও, মোসাদ এজেন্ট যাতে ধরে নেয় ওরা ক্যাপসুলের ভিতরে আছে, এবং ক্যাপসুল দূরে সরে যাচ্ছে বলে রেডিও সিগন্যাল দুর্বল লাগছে।

দেখতে দেখতে কাঁচের ডিশের ঠিক মাঝখানে পৌঁছে গেল খেয়াযান জুবিলি। ওখানে তীব্র উত্তাপ লাগছে ক্যাপসুলের গায়ে।

প্রচণ্ড তাপ সহ্য করবার উপযোগী করেই তৈরি করা হয়েছে ওটাকে। তবে বাইরে বেরিয়ে থাকা ফুয়েল লাইনগুলোর সহ্য ক্ষমতা বেশি হওয়ার কোন কারণ নেই। ওগুলো গলে গেল। ভিতর থেকে লিকুইড অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন বেরিয়ে এল।

ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হওয়ার সময় অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলক মুহূর্তের জন্য অন্ধ করে দিল রানাকে।

'রানা!' প্রায় আর্তনাদের মত শোনাল বারাইদির চিৎকার।

তবে ক্ষতি যা হওয়ার এরই মধ্যে হয়ে গেছে। ফুয়েল ট্যাংকের বিধ্বংসী বিস্ফোরণ ডিশের তার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল আর কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। সাজানো ত্রিশ লাখ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সবগুলো ধ্বংস হয়নি, তবে খুব বেশি রক্ষাও পায়নি।

বিস্ফোরণের উজ্জ্বলতা চোখে সয়ে আসতে ডিশটার ভাঙা, দোমড়ানো-মোচড়ানো, বিধ্বস্ত চেহারাটাই শুধু ধরা পড়ল রানার চোখে।

'রানা, তুমি সৌরজগতের বাইরে চলে যাচ্ছ!' চেঁচিয়ে উঠল বারাইদি। ব্যাপারটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

খালি জুবিলির দিকে তাকাল রানা। বিস্ফোরণের ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে ওটার–ছন্দহীন, এলোমেলো ভঙ্গিতে পাক খেতে খেতে দূরে সরে যাচ্ছে। তবে বারাইদির ধারণা ভুল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যাপসুলটা ছুটে চলেছে সরাসরি সূর্যের দিকে।

জুবিলি পৃথিবীর কক্ষপথ ত্যাগ করবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্রতা অর্জন করেছে কিনা সন্দেহ আছে রানার। তবে শেষ পর্যন্ত সূর্যের কক্ষপথে পৌঁছে চক্কর খেতে পারে–নতুন একটা গ্রহ হিসাবে সূর্যকে পুজো করবে।

'বারাইদি,' বলল রানা, রেডিওর ভলিউম একেবারে কমিয়ে রেখেছে। 'একটা সুসংবাদ দিই। ওটা শেষ।'

'ওরে কুত্তা! তোমার খুশি হবার কিছু নেই। আমরা আরেকটা

ডিশ বানাব। এটা কোন ক্ষতিই না। তুমি হেরে গেছ। মর শালা—মর! মর! মর!'

'আমি যদি হেরেই গিয়ে থাকি, তোমার এত জ্বলছে কেন?'

'কারণ আমার একটা আশা তুমি পূরণ করতে দাওনি,' বলল মোসাদ এজেন্ট। 'তোমাকে আমি নিজের হাতে খুন করতে চেয়েছিলাম।'

রানার গায়ে সেঁটে এল সুরাইয়া, দু'জনেই স্পেস স্টেশনের খোল ধরে ভেসে আছে। খেয়াযান জুবিলি ইতিমধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। অ্যাবির অত্যন্ত শক্তিশালী কোন টেলিস্কোপেও ওটাকে এখন আর দেখতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

'এখন?' চিৎকার করল সুরাইয়া, তার হেলমেট রানার হেলমেটের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

'অপেক্ষা।'

'কী জন্যে, রানা?'

'একটা সুযোগের।' তবে টের পাচ্ছে রানা, অক্সিজেনের অভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে ও, সেটা ঠেকাতে হলে সুযোগটা খুব তাড়াতাড়ি পেতে হবে ওকে।

আর মাত্র দু'মিনিট চলবার মত অক্সিজেন আছে। ফুয়েল লাইন নাড়াচাড়া, বারাইদির সঙ্গে বাক্য বিনিময়, সোলার ডিশকে ধ্বংস হতে দেখে উত্তেজিত হওয়া ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপারে শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে ওকে, ফলে এখন তো মাসুল দিতে হবেই। যতবার ওর হৃদ্‌পিণ্ড একটু জোরে চলেছে, ততবার একটু করে বেশি খরচ হয়েছে অক্সিজেন।

এরই মধ্যে রক্তস্রোতে অক্সিজেন কমে আসবার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে রানা। আচ্ছন্ন বোধ করছে ও, সেফটি লাইন ধরে নির্জীব ভঙ্গিতে ঝুলে আছে। ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হলেও ফুসফুসে বোধ হয় এরকম যন্ত্রণা হত না।

ওর কিছু করবার নেই। এখন শুধু অমোঘ নিয়তির জন্য অপেক্ষা।

পনেরো

‘কষ্ট পেয়ে মরো, রানা। ডাইনী উম্মে সুরাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে মরো। মরো মহাশূন্যে। মরো বাতাস ছাড়া, পায়ের নীচে গ্রহ ছাড়া। এ-কথা জেনে মরো যে ইজরায়েলি ওই খেয়াযানটাই তোমার কবর। সরাসরি জাহান্নামে যাও, রানা, সরাসরি জাহান্নামে!’ প্রচণ্ড ক্রোধে দিশেহারা বারাইদি প্রলাপ বকছে।

রানা আর সুরাইয়ার হেলমেট এক হয়ে আছে, ওরা যাতে রেডিও ব্যবহার না করে কথা বলতে পারে।

‘ও যেন বুঝতে না পারে কোথায় আছি আমরা,’ বলল রানা। কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে আসছে। কপালে জমা বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোঁটায় পরিণত হচ্ছে। শ্বাস টানবার সময় মনে হলো ফুসফুস যেন সিরিশ কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। ওর এয়ার সাপ্লাই দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, সেই সঙ্গে আয়ুও। ‘অপেক্ষা করো। ওদেরকে একটা ভুল করতে দাও।’

‘রানা, তোমার অক্সিজেন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আমারটা শেয়ার করো।’

স্কুবা ডাইভাররা এই কাজ হরদম করছে। কিন্তু ওরা তো পানির তলায় নেই, এমনকী পৃথিবীতেও নেই। চোখ তুলে উপরদিকে তাকাল রানা, পৃথিবীর গাঢ় নীল সাগরগুলোকে পরিষ্কার চিনতে পারল। খুব বেশি দূরে নয়, মাত্র একশো বিশ

মাইল, তবে ওর জন্য কয়েক আলোকবর্ষ দূরে ।

'না, সুরাইয়া, এখানে তা সম্ভব নয় । বিশ্রাম নাও । পিছনে হেলান দিয়ে রিল্যাক্স করো,' শেষ শব্দ দুটো নির্দেশের সুরে বলল । 'আমি ঠিক আছি । শুধু যদি...'

রানার শ্বাস-প্রশ্বাস আরও ধীরে বইছে । ওর মনে হচ্ছে গোটা মহাবিশ্ব আসলে গরম একটা জায়গা । পৃথিবী অনেক দূরে, অথচ সে-কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করছে না ।

ধ্যান শুরু করেছে ও; অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও যাতে বেঁচে থাকতে পারে । অন্তত কিছুক্ষণ...যতক্ষণ পারা যায় ।

থাকল রানা বেঁচে। অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে এক মিনিট আগে । পায়ের তলাটা কাঁপল । এয়ার লক ডোর খুলে গেছে । দু'জন অ্যাস্ট্রনট বাইরে মাথা বের করল । বারাইদির সঙ্গে পৃথিবী থেকে এসেছে তারা। মাথা বের করে দেখছে মহামূল্যবান হাতিয়ার সোলার ডিশের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে ।

ওর এই পজিশন থেকে কায়দামত হামলা করতে পারবে না রানা । লোক দু'জনকে আরও একটু বেরিয়ে আসতে হবে ।

হেলমেটের ভিতর হাঁপাচ্ছে রানা । নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরুচ্ছে, সেটাই শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকছে, ফলে অক্সিজেনের অভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে দ্রুত। কপালের ঘাম গড়িয়ে চোখে পড়ছে। তবু হাল না ছাড়বার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকল ও ।

এবং তার ফলও ফলল ।

অ্যাস্ট্রনটদের একজন এয়ার লক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ঝুলে থাকল শূন্যে, রানার কাছ থেকে দূরত্ব পাঁচ ফুটেরও কম ।

সেফটি লাইনটাকে একটা লূপ বা ফাঁস বানিয়ে ছুঁড়ে দিল রানা। হেলমেট পরা মাথায় একেবারে নিখুঁতভাবে গলে গেল সেটা । বন্দি করে তাকে স্টেশনের দিকে টেনে আনা হচ্ছে, সঙ্গে

সঙ্গে এটা সে টেরও পেল না।

তার অক্সিজেন বটলটা নরম আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করল রানা। ভালভ থেকে কিছু অক্সিজেন লিক করল, সঙ্গে সঙ্গে নিরেট বরফে পরিণত হলো তা, তবে বটলটা নিরাপদে খুলে নিতে পারল ও।

অক্সিজেন সাপ্লাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতে অ্যাস্ট্রনট টের পেল কিছু একটা ঘটেছে। ঘুরতে যাচ্ছে সে। রানা তাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। তার আগে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে ওর সেফটি লাইন বেরিয়ে এসেছে লোকটার গলা থেকে।

লোকটার লাইন টান টান হলো। ইতিমধ্যে নিজের স্পেস সুটে অক্সিজেন বটলটা আটকে নিয়েছে রানা। উন্মত্তের মত হাত পা ছুঁড়ছে ওর প্রতিপক্ষ, রানাকে ওর খালি বোতলটা ঝাঁকাতে দেখছে।

হঠাৎ হাসল রানা। মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। লক্ষ্যস্থির করে খালি বোতলটা ছুঁড়ল ও।

ঘন ঘন ডিগবাজি খেয়ে ছুটল বোতল। ধাতব একটা বুলেট।

ঠিক জায়গাতেই লাগল, যাকে বলে ডিরেক্ট হিট—লোকটার প্লাস্টিক ফেসপ্লেটে।

ফেসপ্লেট ফেটে গেল। লোকটার সুটের ভিতর সামান্য যে বাতাস ছিল, সশব্দে বেরিয়ে এল সদ্য তৈরি ফাঁক দিয়ে। গোটা শরীরে খিঁচুনি উঠল, তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই স্থির হয়ে গেল সে—মারা গেছে।

ফেসপ্লেটে ফাটল ধরায় সুটটা ডিকমপ্রেসড্ হয়ে গিয়েছিল।

শরীরের অভ্যন্তরীণ চাপ—পৃথিবীতে সী লেভেলের উপযোগী—জোর খাটিয়ে সদ্য পাওয়া ভ্যাকিউম-এ বেরিয়ে এসেছে। লোকটা মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জে রাখা হট ডগ-এর মত ফেটে গেছে। পাক খেতে খেতে পাশ কাটানোর সময় লাশের কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসা পিচ্ছিল চোখ, রক্তাক্ত নাক আর কান দেখতে পেল রানা।

যা কিছু ঘটল, সবই একটা ভৌতিক নীরবতার ভিতর।

পায়ের তলায় আবার কাঁপন অনুভব করল রানা। ঘুরে তাকাতেই দেখল দ্বিতীয় অ্যাস্ট্রনট সুরাইয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। তার প্রতিক্রিয়া দেরিতে হলেও, নিজের বিপদটা চিনতে পারবার পর মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুরাইয়ার সুটের এয়ার হোসটা ধরবার চেষ্টা করছে সে।

সুটের সঙ্গে আটকানো সেফটি লাইনটা আবার ছুঁড়ল রানা। এবার লূপ বানাবার সময় পায়নি। লোকটার মাথার ঠিক উপরে রয়েছে রেডিওর অ্যান্টেনা, চাবুকের মত এক বাড়িতেই ভেঙে গেল সেটা।

বারাইদি স্পেস স্টেশনের ভিতরে রয়েছে, তার সঙ্গে লোকটার সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরকম একটা ছোটখাট সাফল্যে তৃপ্ত হতে রাজি নয় রানা। ও কিছু করতে না পারলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যাবে সুরাইয়া।

নাইলন সেফটি লাইন এবার রানা লোকটার পা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। পায়ে ওটা প্যাঁচ খাচ্ছে, টান মারল কষে। লোকটার 'পতন' ঘটল না, তবে তাকে ছাড়িয়ে আনা গেল। সেটাও মন্দ বলা চলে না।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে ভাল কাজ দেখাল সুরাইয়া। লোকটার পিছনে পৌঁছাল সে, দ্রুত হাত চালিয়ে তার সেফটি লাইন খুলে দিল। থামল না, এরপর খপ্ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ম্যানুভারিং জেট ধরে দিল এক টান।

সুরাইয়ার হাত থেকে বটলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল রানা। জেটটা লোকটার বুকে তাক করে দুটো ট্রিগারই টেনে ধরল ও।

শক্ত, নিরেট পালক আকৃতির বরফ রকেটের বেগে বেরিয়ে এসে আঘাত করল তাকে, সরিয়ে দিল স্টেশন থেকে দূরে।

একজন অ্যাক্রব্যাট-এর মত ডিগবাজি খেতে খেতে কালো মহাশূন্যে মিশে যাচ্ছে লোকটা। সঙ্গের অক্সিজেন বটলটা যদি

পুরোপুরি ভর্তিও থাকে, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা বাঁচবে সে।

রানা জানে লোকটার মাথায় এখন কী সব চিন্তা চলছে। ট্রেনিং পাওয়া অ্যাস্ট্রনট, স্পেস সম্পর্কে জানে, জানে তার এই বিপদটা আসলে কী। দু'ঘণ্টা যদি বাঁচেও, এই সময়ের মধ্যে কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসবে না। এই দু'ঘণ্টা হবে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক।

হঠাৎ ক্ষিপ্র একটা নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। এক ঝটকায় নিজের ফেসপ্লেট খুলে ফেলেছে লোকটা। অক্সিজেন আর হিলিয়ামের ঘন সাদা মেঘ বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, ঢেকে ফেলছে শরীরটা।

সেই মেঘের ভিতর ঢুকে বাঁকা হয়ে গেল সূর্যরশ্মি, ফলে মুহূর্তের জন্য একটা রঙধনু তৈরি হলো। তারপর দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেল লোকটা।

তার ব্যক্তিগত অ্যাটমসফিয়ার-এর ক্ষণস্থায়ী নিঃসরণ খুদে রকেট ইঞ্জিনের মত কাজ করেছে; মহাশূন্যের গভীর প্রদেশে ঠেলে দিয়েছে তাকে।

'ওহ, রানা!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল সুরাইয়া। সে-ও দেখছিল। 'কী ভয়ঙ্কর! এ সত্যি বড় করুণ মৃত্যু!'

জবাব দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই হেডফোনে বারাইদির কর্কশ হুংকার শুনতে পেল রানা। 'বাইরে ঘটছেটা কী? ম্যাগনিফাইং ডিশের কী অবস্থা? রিপোর্ট করো।'

ভলিউম কমানোই আছে, কণ্ঠস্বরে ভোঁতা ভাব এনে রানা বিড়বিড় করল, 'মেজর, ডিশের অবস্থা খুব খারাপ। খুবই খারাপ।'

'পুরোটা ভেঙে গেছে? মেরামত করা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল বারাইদি, রানার কণ্ঠস্বর চিনতে পারছে না।

'নাহ, মেরামত করা সম্ভব বলে মনে হয় না। ভেতর দিকের সবগুলো কাঁচ চুরমার হয়ে গেছে...'

‘তোমার আওয়াজ অস্পষ্ট, হেইডেন। রেডিওর ভলিউম বাড়াও।’

‘স্টেশনের বাঁকে রয়েছি কি না,’ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে বলল রানা। রেডিওর ভলিউম আরও কমিয়ে দ্রুত রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে এয়ার লকে ঢুকে রানার জন্য অপেক্ষা করছে সুরাইয়া। ভিতরে ঢুকল রানা, সেফটি লাইন খুলে ভারী আউটার ডোর বন্ধ করে দিল। সুরাইয়ার হেলমেটে নিজেরটা চেপে ধরে বলল, ‘ইন্ডিকেটর লাইট দেখে ওরা সম্ভবত বুঝতে পারবে যে এয়ার লক-এর আউটার ডোর বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই খুব দ্রুত হামলা করতে হবে। রেডি?’

‘রেডি, রানা।’

স্টেশন-এর প্রেশার পেতে অনন্তকাল সময় লাগছে এয়ার লকের। হেলমেট আর প্যাড লাগানো গ্লাভস খুলে ফেলল রানা। সুটটাও খুলতে পারলে খুশি হত, কিন্তু অত সময় পাওয়া যাবে না। ও জানে, এরই মধ্যে বারাইদির মনে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে: কাজ ফেলে তার লোকেরা ফিরে আসছে কেন?

ইনার ডোর খুলছে। ছোট্ট ফাঁক গলে ছুটল রানার শক্ত মুঠো, এক ঘুসিতেই অ্যাস্ট্রনট মেনিনের চোয়ালের হাড় ভেঙে গেল, পিছনে উড়ে গেল সে।

‘তাই তো বলি!’ আঁতকে উঠল বারাইদি, বুঝে ফেলেছে ওরা তার লোকজন নয়।

রানার পাশের দেয়ালে একটা রাবার বুলেট লাগল। লম্বা হয়ে শোবার ভঙ্গিতে শূন্যে স্থির হলো ও, তারপর দেয়ালে জোড়া পা দিয়ে লাথি মারল। একটা বর্শার মত ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকল শরীরটা।

এক হাতে চোয়াল চেপে ধরে মেনিন সিধে হচ্ছে, বুকে রানার দু'হাতের ধাক্কা খেয়ে আবার পিছন দিকে উড়ে গেল সে। এবার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

দেয়ালে লেগে ফুটবলের মত ফিরে আসছে রানা, পা দুটো শরীরের নীচে গুটিয়ে রেখেছে। এই সময় দেখতে পেল বিপদটা।

সরাসরি ওর দিকে অস্ত্র তাক করেছে বারাইদি। সিলিন্ডারের পাশ থেকে ভারী বুলেট উঁকি দিতে দেখল রানা, বুঝতে পারল ওগুলো রাবারের তৈরি নয়।

এ জীবন আর মৃত্যু নিয়ে খেলা।

বারাইদি জানে তার লক্ষ্য যদি ব্যর্থ হয়, বুলেটটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে স্পেস স্টেশনকে ভয়ানক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। ভিতরে অ্যাটমসফিয়ার বলে কিছু থাকবে না।

'বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না, রানা,' শান্ত, একঘেয়ে সুরে বলল সে; চিৎকার করলে বোধহয় এতটা ভয় লাগত না। 'আমার লক্ষ্য ব্যর্থ হতে পারে। তবে ফুটোটা মারাত্মক কিছু হবে না। সেটা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধের ব্যবস্থাও করা আছে।'

তার দৃষ্টি পলকের জন্য বেলুনগুলোকে ছুঁয়ে এল–সারকুলেশন সিস্টেমের ফসল এয়ার কারেন্টে ভেসে বেড়াচ্ছে।

'বেলুনগুলোর ভেতর সীল করার সরঞ্জাম আছে। ছোটখাট ফুটো অনায়াসে বন্ধ করতে পারবে। কাজেই গুলি চালাতে কোন সমস্যা নেই।'

অ্যাবির খোল ফুটো হয়ে গেলে তীব্র বেগে বাইরে বেরুতে শুরু করবে অ্যাটমসফিয়ার, ফলে ফুটোটা টেনে নেবে বেলুনগুলোকে।

রানাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলল বারাইদি, 'আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি। নিজের হাতেই মারব তোমাকে, ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায়–এখানে, না কি পৃথিবীতে? আমার বস্ চান তোমাকে আমি তেল আবিবে নিয়ে গিয়ে দু'দিনের জন্যে ইন্টারোগেটরদের হাতে ছেড়ে দিই।'

সুরাইয়াকে দেখবার আশায় ঘাড় ফেরাল রানা। আশা করছে কিছু একটা ছুঁড়ে বা অন্য কোন ভাবে এক সেকেন্ডের জন্য

বারাইদির দৃষ্টি কাড়বে সে।

কিন্তু না, সুরাইয়া কোন সাহায্যে আসবে না। শূন্যে নিঃসাড় ভেসে আছে সে, মাথাটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে নড়বড় করছে।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করল বারাইদি। 'ডাইনীটা মারা যায়নি। রাবার বুলেটের আঘাতে স্রেফ জ্ঞান হারিয়েছে। ওজনহীনতার কারণে ওরকম বাঁকা হয়ে আছে ঘাড়।'

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রানা সিদ্ধান্ত নিল, বারাইদির হাতে বন্দি হওয়ার চেয়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেবে। পা ছুঁড়ে রওনা হতে যাবে, পিছন থেকে ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ল মেনিন। এই মাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে, পিস্তলটা বের করে চেপে ধরেছে রানার খুলিতে।

'ভেরি গুড।' প্রশংসা করল বারাইদি। 'আবার ওদেরকে স্টোরেজ রুমে রেখে এসো।' রানার দিকে ফিরল সে। 'এবার আর পালাতে হচ্ছে না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্পেস সুট খুলে ফেলতে বাধ্য হলো রানা। পিস্তলের খোঁচা খেয়ে স্টোর রুমে ঢুকতে হলো আবার। ওর পিছনে ঠেলে দেওয়া হলো সুরাইয়ার অজ্ঞান দেহ। ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে।

হঠাৎ করেই আইডিয়াটা মানসপটে উদয় হলো। এই কামরায় প্রথমবার যখন ছিল রানা তখনই মনের গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসবার চেষ্টা করছিল ওটা। ও এখন জানে কীভাবে পালানো সম্ভব। দরকার শুধু খানিকটা সময়।

ষোলো

‘আমি কোথায়?’ মাথাটা এদিক ওদিক দোলাচ্ছে সুরাইয়া, তার লম্বা কালো চুল লম্বাটে মুখের চারপাশে ভেসে আছে। ‘ওহ!’ আঁতকে উঠল সে। ‘আবার সেই স্টোর রুমে ফিরে এসেছি।’

‘চিন্তা কোরো না,’ অভয় দিল রানা। ‘এখান থেকে বেরুবার উপায় আমার জানা আছে। ওদের এই স্টেশনটাও আশা করি ধ্বংস করতে পারব।’

‘কীভাবে?’ দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল সুরাইয়া, প্রশ্নের সুরে অবিশ্বাস।

‘কী কীভাবে?’

‘এখান থেকে বেরুবে, স্টেশন ধ্বংস করবে?’

‘তা হলে অনুমতি দাও,’ নাটুকে ভঙ্গিতে বলল রানা, ‘পারব কি না একটা পরীক্ষা করে দেখাই।’ পকেট হাতড়ে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বের করল। ‘আগে বলো কী ঘটবে।’ একটা কাঠি জ্বালবার প্রস্তুতি নিয়ে স্থির হয়ে আছে।

‘কেন, জ্বলবে ওটা।’

কাঠির মাথাটা ঘষল রানা, স্থিরভাবে ধরে রাখল। বারুদ বিস্ফোরিত হয়েছে, কাঠির শরীর পুড়ছে। তারপর ওর আঙুলে আঁচ লাগতে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি।

‘এর মানে?’ জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া।

‘এর মানে, দেশলাইটা আমি সরাসরি এয়ার ডাক্ট-এর সামনে ধরেছিলাম। স্পেস স্টেশনের এয়ার সার্কুলেটিং সিস্টেম নিশ্চিত করছে ওটার মধ্যে বাতাস থাকবে। এবার দেখো।’ এক্সপেরিমেন্টটা রিপিট করল রানা, এবার ডাক্ট-এর মুখ নিজের শরীর দিয়ে বন্ধ করে রাখল। কাঠির মাথায় আগুন জ্বলল, নিভু নিভু হলো, তারপর নিভেও গেল।

‘এয়ার ডাক্ট থেকে অক্সিজেন আসছিল, কিন্তু সেটা আসার পথ তুমি বন্ধ করে দিয়েছ?’ সন্দেহের সুরে জানতে চাইল সুরাইয়া।

‘মোটেও না। আমি বাতাসের যে প্রবাহ বন্ধ করেছি সেটা ওয়েস্ট প্রোডাক্টস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাঠিটা জ্বলার সময় অনেক রকম বাজে বা ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি করছিল। পৃথিবীতে এই গ্যাসগুলো বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই ওপরে উঠে যায়। ওজনশূন্য পরিবেশে একটা আরেকটার চেয়ে হালকা, এরকম নয়; প্রতিটি জিনিসের ওজন একই–শূন্য। নষ্ট গ্যাস কাঠির মাথার চারদিকে থেকে যায়, কাজেই অক্সিজেন ওখানে থাকতে পারে না, ফলে নিভে যায় ওটা।’

আরেকটা কাঠি জ্বালল রানা, এবার ওটাকে ধীরে ধীরে সরাচ্ছে। দেখা গেল উজ্জ্বল শিখার পিছু নিয়েছে গ্যাসগুলো।

‘এটা প্রথমবারের মতই–মনে করো স্টেশনের সার্কুলেশন সিস্টেম যে এয়ার কারেন্ট তৈরি করছে সেটায় ধরেছি কাঠিটা।’

‘বেশ, বুঝলাম–তো কী হলো?’

‘আমি তোমাকে দেখাবার চেষ্টা করছি যে কক্ষপথে বস্তুর পুড়ে যাওয়াটা একটু অন্য রকম। ফিজিক্সের নিয়মগুলো সব একই থাকছে, কিন্তু ওগুলোর এনভায়রনমেন্ট আলাদা। তাতে করে নতুন ফ্যাক্টর বেরিয়ে আসছে, যেগুলোর কথা পৃথিবীতে সাধারণত আমরা চিন্তাই করি না।’

‘অর্থাৎ তুমি একটা দেশলাই জ্বালবে, তারপর বারাইদিকে অবাক করার জন্যে আবার ওটা নিভিয়ে ফেলবে?’

‘ওহ, অবিশ্বাসিনী! এসো, এই অ্যালুমিনিয়াম প্লেটটা গুঁড়ো করি–মানে, তুমি আমাকে সাহায্য করো।’ একটা ফাইল নিল রানা, তারপর অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটটাকে মিহি করে চাঁছতে শুরু করল।

তবে কাজটা সহজ নয়। চাপের মধ্যে পড়ে পিছলে বেরিয়ে

যেতে চাইছে প্লেটটা, রানাও জিরো-গ্র্যাভিটিতে কাজ করে অভ্যস্ত নয়। ভাঁজ করা বাঁ পা দিয়ে একটা থামকে জড়াল ও, কাজের জায়গা ছেড়ে শরীর যাতে ভেসে যেতে না পারে।

'কেন?'

'কারণ এটাই আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে। আসলে, যে-কোন জিনিসই তুমি গুঁড়ো করতে পারো, মানে অ্যালুমিনিয়াম না হলেও চলবে। তবে যাই গুঁড়ো করো, সেটা কিন্তু মিহি হওয়া চাই। ময়দার মত।'

'এখানে তুমি ময়দা পাবে না।'

'তা আমি জানি। বলতে চাইছি যে-কোন জিনিস গুঁড়ো করতে পারো তুমি, তবে তা যেন ময়দার মত মিহি হয়। যত মিহি হবে তত ভাল।'

ভুরু কোঁচকালেও, সুরাইয়াও হাত লাগাল কাজটায়। খানিক পর উজ্জ্বল হলো তার চোখ-মুখ, বলল, 'বুঝেছি! এগুলো জ্বলবে, তারপর গোটা স্টেশনে আগুন ধরে যাবে। কিংবা বিষাক্ত বাষ্প তৈরি হবে। কিন্তু...অ্যালুমিনিয়াম তো পোড়ে না। এ-ও পোড়ে না,' বলে বাক্স আর কড়িকাঠ থেকে সংগ্রহ করা কাঠের গুঁড়োর একটা স্তূপ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল।

'চেষ্টা করে দেখো,' বলল রানা, দেশলাইটা ছুঁড়ে দিল সুরাইয়ার দিকে।

সুরাইয়া কী করে দেখছে রানা। কাঠের গুঁড়োগুলো জড়ো করে খুদে একটা মেঘ তৈরি করল সে, হাতের চাপ দিয়ে একটা আকৃতি দিল, স্থিরভাবে ঝুলিয়ে রাখল নিজের সামনে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল, তারপর গুঁড়োগুলোর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল জ্বলন্ত কাঠিটা। কয়েকবার নিভু নিভু হয়ে শিখাটা একেবারে নিভেই গেল।

দেশলাইটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সুরাইয়া। 'কাজ হলো না,' ম্লান সুরে বলল সে। 'আমার কোন ধারণা নেই ঠিক কী তুমি

করতে চাও।'

'আগে যা বলেছি তা তুমি মনে রাখোনি। ফিজিক্সের নিয়ম পৃথিবীতে যা, এখানেও তাই, তবে ওজনহীনতার কারণে অ্যাপ্লিকেশান বদলে যাবে। তোমার তৈরি ওই মেঘের কণা জ্বলে ওঠার মত প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পায়নি।'

'এখন তা হলে কী হবে?'

'এখন আমরা আরও অনেক বড় মেঘ তৈরি করার জন্যে প্রচুর গুঁড়ো সংগ্রহ করব। তারপর নিজেই দেখতে পাবে কী হয়!'

রানার মনে হলো কয়েক ঘণ্টা ধরে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। ইতিমধ্যে কয়েক কিলো অ্যালুমিনিয়াম পাউডার পেয়েছে ও। সুরাইয়ার তৈরি কাঠের গুঁড়োর স্তূপটা আকারে আরও বড়। সব একটা ক্যানিস্টারে ভরে দরজার পাশে রেখে দিল ও।

'এখন অপেক্ষা,' বলল রানা, পকেটে হাত চাপড়ে নিশ্চিত হয়ে নিল দেশলাইটা জায়গামত আছে কি না।

'এটাই সবচেয়ে কঠিন।'

'তবে তৈরি থাকো। আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এয়ার লকে ঢুকতে হবে, স্পেস সুটও পরতে হবে।'

'কেন? আমরা কোথাও যাচ্ছি? তুমি বোধহয় ভুলে গেছ যে আমাদের ক্যাপসুল দূর মহাশূন্যের উদ্দেশে ছুটে চলেছে।'

'আর তুমি ভুলে গেছ বাইরে আমাদের জন্যে আরেকটা ক্যাপসুল অপেক্ষা করছে। বারাইদিরটা। ওটা আমরা অনায়াসেই নিতে পারি, প্রথমটা যেমন নাজাফি স্পেস সেন্টার থেকে নিয়েছিলাম।'

'তোমার তো দেখছি আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই, রানা। তোমার মত হতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আমার ধারণা এখানে আমাদের মরতে হবে। ওই লোক, বারাইদি...'

'চিন্তা কোরো না,' আবার অভয় দিল রানা। 'এতে কাজ

হবে।’

মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওরা। কে জানে বারাইদি কখন ওদেরকে এখান থেকে বের করবার সিদ্ধান্ত নেবে।

নাজাফি স্পেস সেন্টারের কথা ভাবল রানা। বিস্ফোরণে নিশ্চয়ই সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

‘রানা!’ হঠাৎ ফিসফিস করল সুরাইয়া, রানাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ‘ওরা আসছে!’

সুরাইয়াকে এমনভাবে সরিয়ে দিল রানা, ভেসে স্টোর রুমের পিছন দিকে চলে গেল সে। কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম আর এটা-সেটা নানা জিনিসের গুঁড়ো ভর্তি কন্টেইনারটা—কোন ওজন নেই—শক্ত করে ধরে রেখেছে ও।

কামরার বাইরে থেকে ইজরায়েলি লোকটা দরজার ছিটকিনি খুলছে, কন্টেইনারের সমস্ত গুঁড়ো সরাসরি কবাট লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল রানা।

নিবিড় একটা স্রোতের মত দেখাচ্ছে, গতি মন্থর। ওগুলোর ছোট ছোট প্রবাহ সৃষ্টি হতে দেখল রানা—এয়ার ভেস্টগুলো থেকে বেরুনো তাজা অক্সিজেনকে পাশ কাটাচ্ছে।

এতে করে মেঘের ভিতর দিকে আলোড়ন উঠল, কণাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

দরজাটা যখন খুলল, ধুলোর মেঘকে তখন আর বাধা দেওয়ার কোন উপায় নেই। অ্যাস্ট্রনটদের একজন পাউডারের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘আঁ-আঁ-আঁ!’ মেঘটা গ্রাস করবার সময় তার গলা চিরে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। দৃশ্যটা ঝাপসা, তবে দেখতে পেল রানা—ঘন ঘন হাত ঝাপটাচ্ছে লোকটা, ছুটে পালাচ্ছে।

সুরাইয়াকে সংকেত দিল রানা। ভাসমান রাশি রাশি পাউডারের পিছু নিয়েছে ও, বেরিয়ে যাচ্ছে কামরা ছেড়ে। এয়ার

সার্কুলেশন সিস্টেম ঘন মেঘটার নাগাল পেয়ে গেল, ফলে স্পেস স্টেশন অ্যাবির মূল অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল ওগুলো।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে কনসোলটা খুঁজে নিল রানা। হাই ভোল্টেজ ট্র্যান্সফর্মারগুলো ওকে পথ দেখিয়ে কমিউনিকেশন রিগ-এর কাছে নিয়ে এল। দেশলাইয়ের অবশিষ্ট কাঠি পাওয়ার রিলে-র কনট্যাক্টগুলোর মাঝখানে গুঁজে দিল ও। ওই রিলেতে যদি পাওয়ার অ্যাপ্লাই করা হয়, কাঠিগুলো জ্বলে উঠবে।

রানা আশা করছে কোন ইনকামিং মেসেজ নেই। অন্তত আপাতত।

'এয়ার লকে চলে যাও,' হিসহিস করে সুরাইয়াকে বলল রানা। ওদের তৈরি পাউডার ঘন কুয়াশার পরদার মত স্পেস স্টেশনের ভিতর সব কিছু ঢেকে ফেলেছে। 'ওদিকের ওই দেয়াল ধরে বাঁক ঘোরো, তা হলেই পৌঁছে যাবে এয়ার লকে। জলদি, সুরাইয়া, জলদি! তোমাকে সুট পরতে হবে।'

'আর তুমি?'

সুরাইয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রানা চিৎকার করে ডাকল, 'বারাইদি?' তার মত একজন বেপরোয়া শত্রুকে পিছনে রেখে পালাবার কথা ভাবতে পারছে না ও। 'কোথায় তুমি?'

ওর ওয়ালথারের টগ্‌ল্ পিছিয়ে আনবার ক্লিক আওয়াজটা চিনতে পারল রানা, তারপর রিলিজ হলো, যাতে একটা শেলকে সামনের ফায়ারিঙ চেম্বারে পৌঁছে দেওয়া যায়।

ধুলোর তৈরি পরদার আড়াল নিয়ে রানার সঙ্গে খেলছে বারাইদি। খেলাটায় অংশ নেওয়ার আগে নিশ্চিত হয়ে নিল ও, অবশিষ্ট পাউডার এয়ার কন্ডিশনিং ডাক্ট-এ পৌঁছেছে।

এর ফলে ধাতব মেঘ কয়েক ঘণ্টা সচল থাকবে। ইজরায়েলিদের এয়ার ফিলট্রেশন সিস্টেম যতই কাজের হোক, ফিলটারগুলোকে এখন অনবরত পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। অ্যাস্ট্রনটরা আবার যখন তাজা বাতাসে শ্বাস গ্রহণের সুযোগ

পাবে, তার অনেক আগেই সুরাইয়াকে নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়বে রানা–কিংবা মারা যাবে।

'তোমাকে আমি খুন করব, রানা,' ধুলোর পরদার ওদিক থেকে ভেসে এল মোসাদ এজেন্টের কণ্ঠস্বর। 'তুমি মারা যাবে তোমার নিজের পিস্তলের গুলিতেই।'

সুরাইয়া যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে রওনা হলো রানা, বারাইদির কর্কশ কণ্ঠস্বর অনুসরণ করছে। যদি সম্ভব হয়, সুরাইয়ার কাছ থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় ও। সাবধানে এগোচ্ছে রানা, পায়ে নরম কিছু ঠেকল–মোচড় খাচ্ছে।

অ্যাস্ট্রনটদের একজন, যে লোকটা স্টোররুমের দরজা খুলে দিয়ে ধুলোর হামলা সহ্য করতে না পেরে পিছিয়ে এসেছিল। মেঝেতে পড়ে থাকবার কারণটা অবশ্য বোঝা গেল না–হয়তো গলার ভিতর পাউডার ঢোকায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার পেটে একটা লাথি কষল রানা। লোকটা ওর পা জড়িয়ে ধরল। ডান হাতটা ঝাঁকাতে তালুতে চলে এল ছুরিটা, ঘ্যাচ করে সেটা শত্রুর নিরাবরণ গলায় ঢুকিয়ে দিল ও।

'রানা!' সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আমি রেডি।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। সুরাইয়া নিশ্চয় ওর সুটটাও রেডি করে রাখছে, ও যাতে এয়ার লকে পৌঁছেই ঝটপট পরে নিতে পারে। তখন প্রতিটি সেকেন্ডের উপর নির্ভর করতে পারে জীবন অথবা মৃত্যু। তবে তার আগে বারাইদির ব্যবস্থা না করলেই নয়।

অ্যালুমিনিয়াম আর কাঠের মিহি গুঁড়ো স্পেস স্টেশন অ্যাবির মেইন রুমের ভিতর দৃষ্টিসীমা নামিয়ে এনেছে প্রায় শূন্যে। স্থির হয়ে কান পাতল রানা।

মেনিন ফিসফিস করে কী যেন বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে হিস হিস করে উঠল বারাইদি, কথা বলতে নিষেধ করল।

তার শ্-শ্-শ্-শব্দ লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা, ছুরি ধরা হাতটা

সামনে বাড়িয়ে ধরেছে।

ছুরির ফলা মাংসের ভিতর জায়গা করে নিল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল বারাইদি, হাত থেকে ছুটে গেল ওয়ালথার। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে পিস্তলটার পিছু নিল রানা।

আলোড়িত ধাতব কণার ভিতর হাতড়াচ্ছে ও। ওয়ালথারটা পেতেই শরীর মুচড়ে ওখান থেকে সরে আসবার চেষ্টা করল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রুপালি মেঘের দিকে। পর পর দুটো গুলি করল ও, বারাইদি আর মেনিনকে ব্যস্ত রাখবার জন্য। তারপর রওনা হলো এয়ার লকের দিকে।

'কী করব, মেজর?' মেনিনের ক্লান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'এ-সব আমরা বাতাস থেকে সরাব কীভাবে? ফিল্টারগুলো তো বুজে যাচ্ছে।'

'সিস্টেমটা বন্ধ করে দাও। তারপর একটা ম্যাগনেট নিয়ে এসে বাতাস থেকে ধাতব পাউডার টেনে নাও।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। নন-ম্যাগটেনিক বলেই অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহর করেছে ও। বারাইদি যে বুদ্ধি আঁটছে তাতে কাজ হবে না। কল্পনার চোখে মোসাদ এজেন্টকে ভাসমান মেঘের ভিতর কুঁজো হয়ে থাকতে দেখল ও, আহত হাতটা আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে, রাগে আর হতাশায় দিশেহারা।

'রানা,' আবার সুরাইয়ার গলা ভেসে এল। 'জলদি!'

এয়ার লকটা পেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। সুটের ভিতর পা ঢোকাচ্ছে, ওদিকে হাত দিয়ে হুইল ঘুরিয়ে ইভ্যাকিউয়েশন প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে, এতটুকু দেরিও মর্মান্তিক পরিণতি বয়ে আনতে পারে।

প্রেশার দ্রুত কমে আসছে। রানার মাথায় হেলমেটটা বসিয়ে দিল সুরাইয়া। আর ঠিক তখনই আউটার ডোর খুলে গেল। অনন্ত অসীম মহাশূন্য, অর্থাৎ স্পেস-এর দিকে তাকাল রানা।

'বারাইদির স্পেস ক্যাপসুলে,' নির্দেশ দিল ও। 'কুইক!

পৃথিবীতে ওরা রেডিও মেসেজ পাঠাবার আগেই ওটায় আমাদের পৌঁছাতে হবে।'

'আচ্ছা,' বলল সুরাইয়া। 'তুমি ভয় পাচ্ছ নাজাফি স্পেস সেন্টারকে নির্দেশ দেবে বারাইদি–ক্যাপসুলের নিয়ন্ত্রণ যেন নিজেদের হাতে তুলে নেয় তারা?'

'না। ওরা যেন রেডিও ব্যবহার করতে না পারে, তার আগেই এখান থেকে সরে যেতে হবে। দেশলাইয়ের সবগুলো কাঠি আমি ওদের রেডিও ইউনিটের হাই ভোল্টেজ রিলেতে রেখে এসেছি।'

'কিন্তু...' শুরু করল সুরাইয়া।

'এখন আর কোন কথা নয়। আগে ক্যাপসুলে পৌঁছাই চলো,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা।

'আ-আমি পারব না, রানা।' ভয়ে শিউরে উঠল সুরাইয়া। এয়ার লক ডোর-এর ভিতর দিকটা এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছে, যেন ওটার উপরই নির্ভর করছে তার বেঁচে থাকা বা না থাকাটা। হেলমেটের ভিতর থেকে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি লক আর বারাইদির স্পেসশিপের মাঝখানের ফাঁকটা ধরে প্রসারিত হলো–লম্বা একটা ডকিং ডিভাইসের সাহায্যে স্টেশনের সঙ্গে আটকানো ওটা।

স্পেস স্টেশন অ্যাবিতে প্রথম এসেছে খেয়াযান জুবিলি, ফলে একমাত্র ডকিং বে দখল করে নিয়েছে সেটা। পরে এসে অগজিলিয়ারি ডিভাইস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে বারাইদি। এখন মধ্যবর্তী ফাঁকটা আতঙ্কিত করে তুলেছে সুরাইয়াকে।

'এর আগে তুমি বাইরে বেরিয়েছ। এর মধ্যে ভয় পাওয়ার সত্যি কিছু নেই,' বলল বটে রানা, তবে বুঝতে পারছে সুরাইয়ার ভয় সহজে দূর হওয়ার নয়। তাকে কী করতে হবে, এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার প্রচুর সময় পেয়েছে সে–ফাঁকা স্পেস পার হয়ে পৌঁছাতে হবে বারাইদির শাটল থ্রি স্টারে–ফলে মনের গভীরে দানা বেঁধেছে সত্যিকার ভয়।

হাতে যথেষ্ট সময় থাকলে ডকিং আর্ম ধরে ধীরে ধীরে দূরত্বটা

পার হতে বলা যেত সুরাইয়াকে, কিন্তু তা নেই। সময়মত থ্রি স্টারে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হলো জাম্প করা। জাম্পটা বিপজ্জনকই হবে, কারণ সঙ্গে নাইলনের সেফটি লাইন থাকবে না।

'আগে বাইরে বেরিয়েছি সেফটি লাইন সহ। ওটা আমাকে স্টেশনের সঙ্গে আটকে রেখেছিল। কিন্তু এখন শূন্যে লাফ দিয়ে ভেসে যেতে হবে।'

'মনে নেই, ডিশটার কাছে যাবার সময় আমার সঙ্গেও সেফটি লাইন ছিল না?' নরম সুরে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল রানা। 'ব্যাপারটা হ্যাং গ্লাইডিং-এর মত। পার্থক্য শুধু তোমার মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগবে না।

'তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে, আর পতনের অনুভূতিটা এখন যেটা অনুভব করছ তারচেয়ে আলাদা কিছু হবে না। এসো!' চট করে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে ইনার লক ডোরটা দেখে নিল ও, ভয় পাচ্ছে দড়াম করে খুলে বাইরে বেরিয়ে আসবে মেজর বারাইদি।

তা অবশ্য সম্ভব নয়। ওরা যতক্ষণ আউটার ডোর খুলে রেখেছে, ইনার ডোর খুলবার সাহস হবে না তার—স্পেস সুট পরা না থাকলে।

প্রসঙ্গত আরেকটা কথা ভাবল রানা: ওর প্ল্যানটা কাজ করবে, কঠিন পরিশ্রমে তৈরি পাউডার শুধু যদি অ্যাটমসফিয়ারে ভেসে থাকে।

'কিন্তু আমার নীচে নিরেট কিছু থাকবে না। পা দুটো স্টেশনকে ছুঁয়ে আছে। লাফ দিলে কোথাও কিছু আর পাব না...'

বারাইদি হাই পাওয়ার রেডিও রিগ অন করলে কী ঘটবে, চিন্তা করে শিউরে উঠল রানা। 'সুরাইয়া, মন দিয়ে শোনো। আমাদের হাতে একদমই সময় নেই। গোটা স্টেশন বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে।'

'আরেকবার বলো।'

'স্টেশনের ভেতরে একটা টাইম বোমা আছে। এ রকম একটা সময়ে ভয় পাওয়াটা বিলাসিতা। বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে যেতে হবে...'

'থামো, প্লিজ,' বাধা দিল সুরাইয়া। 'টাইম বোমা? কী বলছ? তোমার সঙ্গে তো কোন বিস্ফোরকই ছিল না...'

রানা বুঝল, সুরাইয়ার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। পিছন থেকে তাকে হঠাৎ ধাক্কা দিল ও।

সুটের রেডিও থেকে সুরাইয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। দেরি না করে তাকে অনুসরণ করল রানা, এয়ার লক ডোরের কিনারায় জোড়া পায়ের লাথি মেরে।

মারাত্মক ভুলটা উপলব্ধি করবার পর রানার শিরায় শিরায় যেন বরফ জমতে শুরু করল। এ হলো মহাশূন্যে ওর অনভিজ্ঞতার ফল। কীভাবে জাম্প করল যে লক্ষ্য থেকে এত দূরে চলে এল ওরা?

সুরাইয়াকে ধাক্কা দেওয়াটা ত্রুটিহীন হয়নি। রানা লাফও দিয়েছে সুরাইয়াকে যতটুকু ধাক্কা দিয়েছে তারচেয়ে জোরে। সুরাইয়ার চেয়ে ওর গতি বেশি হয়ে যাওয়ায় তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও, দু'জনেই কয়েক গজ দূর থেকে পাশ কাটাচ্ছে থ্রি স্টারকে।

আতঙ্কের গলা টিপে ধরে সুরাইয়ার দিকে তাকাল রানা। প্লাস্টিক হেলমেটের ভিতর তার চোখ দুটো বন্ধ দেখল। কোমরটা জড়িয়ে ধরে মেয়েটিকে নিজের দিকে টেনে নিল ও।

'শোনো,' দ্রুত বলল রানা। 'আমার ভুল হয়েছে। দু'গজ দূর থেকে ক্যাপসুলকে পাশ কাটিয়ে এসেছি আমরা।'

রানার আলিঙ্গনের ভিতর শরীরটা মুচড়ে তাকাল সুরাইয়া।

ওদের পিছনে ধীরে ধীরে আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে স্পেসক্রাফট থ্রি স্টার, পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার একমাত্র বাহন। কোন সন্দেহ নেই যে ওদের কপালও সেই অ্যাস্ট্রনটের মত পুড়েছে, রানা যাকে স্টেশন থেকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

অক্সিজেন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভেসে বেড়াবে ওরা, তারপর ধীরে ধীরে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কিংবা, সেই লোকটার মত, অনন্ত অসীম শূন্যতায় নিজেদের ফেসপ্লেট খুলে ফেলতে পারে, মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

সতেরো

'কিন্তু আমরা তো স্টেশনে ফিরে যেতে পারি! আমাদের সেফটি লাইন...' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সুরাইয়ার গলাটা ধীরে ধীরে বুজে এল–থ্রি স্টারের উদ্দেশে লাফ দেওয়ার জন্য ওদের সেফটি লাইন খুলে নিয়েছে রানা।

'মহাশূন্যে সব কিছু অন্য নিয়মে ঘটে। আমরা বাইরের দিকে যাচ্ছি, ঠিক যে ভেলোসিটিতে আমার পা দুটো আমাকে স্টেশন থেকে লঞ্চ করেছিল।'

'তারমানে আমরা মৃত, ধরে নেব?' ম্লান সুরে জিজ্ঞেস করল সুরাইয়া। আশ্চর্য শান্ত লাগছে তাকে। মনে মনে তার প্রশংসা করল রানা।

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,' বিড়বিড় করল রানা। ভাবছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তৈরি ডিশ আর অ্যাবি স্পেস স্টেশন ধ্বংস করবার প্ল্যান দুটোকে ভালই বলতে হবে, নিজের পিঠ চাপড়াবার মত। ঘাড় ফিরিয়ে স্টেশনের দিকে তাকাল ও, লম্বা চকচকে ধাতব সিলিন্ডার এখনও অটুট। বারাইদি কী কারণে কে জানে হাই ভোল্টেজ রেডিও রিগ অন করেনি। করলে দেশলাইয়ের কাঠিগুলো জ্বলবে, তারপরই–বুম!

‘আমাদের এখন একটা রকেট দরকার,’ বলল সুরাইয়া। তার দৃষ্টি মিছে আশায় নিজেদের সুটে নেমে এল, বেল্টে যদি একটা Co_2 ম্যানুভারিং জেট দেখতে পায়। থাকবার কথা নয়, কাজেই নেই।

‘কী বললে তুমি?’

‘একটা রকেট। আমাদের একটা রকেট দরকার।’

‘আছে তো! ইস্, এত বোকা হলাম কী করে!’ সুটের নীচের দিকে হাত লম্বা করল রানা। চেইন লাগানো একটা পকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করল।

জ্বলজ্বলে একটা নক্ষত্রের দিকে সরাসরি এগোচ্ছে ওরা। হাতের পিস্তল তুলে সেটায় লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টানল রানা।

কিছু ঘটছে বলে মনে হলো না। আবার গুলি করল রানা। আবার। আবার। একে একে পাঁচটা গুলি করল, যেন বহু দূর নক্ষত্রের গায়ে নিখুঁত একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবে।

‘কিছু ঘটছে না, রানা। কাজ হয়নি।’

রানা অনুভব করল, সুরাইয়া ওকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তবে ভুল হয়েছে তার। ওর প্রিয় অস্ত্র দায়িত্ব পালন করেছে।

আরেকটা তারার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা—পৃথিবীর অ্যাস্টমসফিয়ার-এর ঝাপসা কিনারায়। তারাটার ধারাল রশ্মি সামান্য নড়ে যাচ্ছে ওদের অবস্থান বদলের কারণে। খানিক পর, এমনকী সুরাইয়াও বুঝতে পারল যে ওরা স্পেস স্টেশনের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

একটা বিপদ কাটতে না কাটতে আরেকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। রানা জানে না আদৌ এটাকে এড়াবার সময় পাওয়া যাবে কি না।

সন্দেহ নেই নিজেদেরকে এতক্ষণে সামলে নিয়েছে বারাইদি আর মেনিন। পরবর্তী নির্দেশের জন্য যে-কোন মুহূর্তে পৃথিবীর

সঙ্গে যোগাযোগ করবে তারা। সেটা ঘটবার আগে থ্রি স্টারে চড়ে দূরে সরে যেতে হবে ওদেরকে।

সময় পেরুচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক অলস ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে স্পেসক্রাফট থ্রি স্টার। মহাশূন্যে এই ব্যাপারটা রানার খুব আশ্চর্য লাগে। গতি আন্দাজ করবার জন্য কোন রেফারেন্স পয়েন্ট না থাকায়, মনে হয় ওরা স্থির হয়ে আছে, এগিয়ে আসছে থ্রি স্টারই।

তবে সময় মত ওটায় ওরা উঠতে পারলে এ-সবে কিছু আসে যায় না। কোর্স সামান্য বদলাবার জন্য আরেকটা গুলি করল রানা। এবার সরাসরি স্পেসক্রাফটের দিকে এগোচ্ছে।

প্রথমে নিজে ঢুকল রানা, তারপর খোলা হ্যাচে টেনে নিল সুরাইয়াকে। খেয়াযান জুবিলির চেয়ে থ্রি স্টার আকারে বড়। এটায় পাঁচজন অ্যাস্ট্রনটের বসবার ব্যবস্থা আছে। প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের পিছনেই বড়সড় স্টোরেজ স্পেস। রানা ধারণা করল, এটা একটা নতুন মডেল।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে কাউচে বসল রানা। প্যানেল পরীক্ষা করে একাধারে স্বস্তিবোধ করল, আবার দুশ্চিন্তাতেও পড়ল।

থ্রি স্টারের প্যানেল ডিজাইন হুবহু জুবিলির মতই। জুবিলির ফুয়েল লাইন খোঁজাখুঁজি আর ফায়ারিং সুইচ নাড়াচাড়া করে কীভাবে ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে হবে, তা রানার জানা হয়ে গেছে–স্বস্তি বোধ করবার এটাই কারণ।

আর দুশ্চিন্তায় পড়বার কারণ হলো, প্যানেলে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করায় কীভাবে কোর্স বদলাতে হবে, পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে রিএন্ট্রির পদ্ধতি, কীভাবে ল্যান্ড করবে ইত্যাদি কিছুই রানার জানা নেই।

তারপর দেখা গেল, আরও একটা ব্যাপার জানা নেই ওর, ফলে ইঞ্জিন স্টার্ট নিলেও থ্রি স্টার নড়ছে না–ডকিং আর্ম শক্ত

করে ধরে রেখেছে ওটাকে।

‘এ আবার কী মুসিবত, রানা? লক না খুললে আমরা ছাড়া পাব না।’

প্যানেলের সুইচগুলো এক এক করে অন-অফ করে দেখতে পারে রানা, ভাগ্যক্রমে তালাটা যদি খুলে যায়। কিন্তু তাতে ঝুঁকি আছে মারাত্মক–থ্রি স্টার অচল বা অকেজো হয়ে যেতে পারে, এমনকী বিস্ফোরিত হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

আর যদি এমন হয় যে লকিং আর্ম শুধু স্পেস স্টেশন অ্যাবির দিক থেকে অপারেট করা যায়, তা হলে মোসাদ এজেন্ট বারাইদির হাতে বন্দি হয়ে আছে ওদের নিয়তি।

‘এটা জীবন-মরণ সমস্যা, সুরাইয়া। কাজেই জুয়া খেলতে হয়।’ স্পেস সুটে ফিট করা রেডিও লিঙ্ক অন করল রানা, তারপর ডাকল: ‘বারাইদি? আমি রানা। আমরা তোমার ক্যাপসুলের ভেতর।’

‘আমি সুট পরেছি, রানা। এক মুহূর্তের জন্যে বাইরে বেরুব। তুমি পালাতে পারবে না,’ বারাইদির কণ্ঠস্বর নিস্তেজ শোনাল রানার কানে। সে-ও নিজের স্পেস সুটের রেডিও ব্যবহার করছে। মনে মনে অভিশাপ দিল রানা। ওর আশা পূরণ করবার জন্য বারাইদিকে স্টেশনের হাই পাওয়ার রেডিওটা অন করতে হবে।

‘ব্যাপারটা নিয়ে তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ, বারাইদি। আমরা এরইমধ্যে পৃথিবীর পথে রওনা হয়ে গেছি। আমি শুধু তোমাকে গুডবাই জানাতে চাইছিলাম।’

‘থ্রি স্টারকে তুমি ল্যান্ড করাতে পারবে না,’ হিসহিস করে বলল বারাইদি। ‘ওটা শুধু গ্রাউন্ড থেকে কন্ট্রোল করা যায়।’

‘ওরা জানবে কীভাবে যে থ্রি স্টার নিয়ে আমরা নামছি?’ হাসল রানা। ‘চেষ্টা করে দেখতে পারো, পৃথিবীর সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করতে পারবে না–স্টেশনের রেডিওটা আমি নষ্ট করে

দিয়ে এসেছি। বিদায়, বারাইদি।'

কাউচে হেলান দিল রানা। অপেক্ষা করছে। ভাবছে কখন রেডিওটা পরীক্ষা করবে সে।

তারপর ব্যাপারটা ঘটল। নিঃশব্দ বিস্ফোরণে স্পেস স্টেশন অ্যাবি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। উড়ন্ত শ্র্যাপনেল ওদের স্পেসক্রাফট ফুটো করে দিতে পারে। তবে সে রকম কিছু ঘটল না। ডকিং আর্মটা ভেঙে বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে, সেটাকে নিয়েই ছুটল থ্রি স্টার।

'কী হলো রানা?' স্পেস স্টেশন অ্যাবিকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখছে সুরাইয়া, ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল চোখ দুটো।

'বাতাসে আমরা যে গুঁড়ো উড়িয়ে দিয়েছিলাম। অ্যালুমিনিয়াম আর কাঠের গুঁড়ো। সব আগুন ধরে গেছে।'

'কিন্তু মনে আছে, স্টোররুমে ওগুলোয় আমি আগুন ধরাতে চেষ্টা করে পারিনি?

'তোমার মনে আছে, আমি বলেছিলাম–তুমি এখনও পৃথিবীর নিয়মে চিন্তা-ভাবনা করছ? এটা মহাশূন্য। ওজনহীনতা।'

'অর্থাৎ?'

'পৃথিবীতে সারাক্ষণ আমরা ধানকল চালাচ্ছি। ধানের ধুলো বাতাসে ভেসে থাকে, আগুনের ফুলকি লাগলে ওগুলো জ্বলবে। কিন্তু ধান নিজে জ্বলবে না।'

'কেন?'

'সবই জ্বলবে, সেটা যদি যথেষ্ট ছোট হয় এবং জ্বলার জন্য সহায়ক যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে।' এরপর রানা ব্যাখ্যা করল, স্পেস স্টেশনের অ্যাটমসফিয়ারে গুঁড়োগুলো দুটো কারণে ছেড়েছিল ও–নিজেদের পালানোটা আড়াল করতে আর স্পেস স্টেশনটাকে ধ্বংস করতে।

দোমড়ানো-মোচড়ানো ধাতব আবর্জনা ছাড়া স্পেস স্টেশনের

আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মাত্র কয়েক কিলোগ্রাম ধুলোর কাজ। সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, অথচ ওদের চোখের সামনেই ঘটেছে।

'রানা, আমি অসুস্থবোধ করছি। হ্যাচ দিয়ে বাইরে তাকাও।'

'উপরে' তাকাল রানা, দেখল কী কারণে সুরাইয়া অসুস্থবোধ করছে। বিস্ফোরণের ফলে থ্রি স্টার বাইরের দিকে ছিটকে পড়েছিল, তারপর উন্মত্ত একটা ভঙ্গিতে ডিগবাজি আর পাক খেতে শুরু করেছে। পৃথিবী এমন অদ্ভুত সব আকৃতি নিয়ে বারবার পাশ কাটাচ্ছে, রানা নিজেও দৃষ্টিবিভ্রমের শিকার হলো। সব ঠিকঠাক বুঝতে পারবার জন্য চোখ বন্ধ করে ঢোক গিলতে হলো ওকে।

'আমরা কঠিন বিপদেই পড়েছি, সুরাইয়া। আমার বসকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ঠিকই, বিসিআই হয়তো উত্তর কোরিয়ার অরবিটিং স্যাটেলাইটকে মেসেজ রিসিভ করবার জন্যে অনুরোধও করেছে,' সুটের আরেকটা পকেট থেকে ঝরণা কলমটা বের করল রানা, জানে না এত ছোট একটা রেডিও মহাশূন্যে আদৌ কাজ করবে কিনা, 'কিন্তু ওরা কী আমাদেরকে ল্যান্ড করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে? প্যানেলে তো শুধু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে–আমরা এগুলোর অর্থ না জানলে বিসিআই জানবে কীভাবে?'

'রানা, এ-সব কথা পরে ভেবো। আমার মাথা ঘুরছে...'

'দাঁড়াও, কেবিনটাকে প্রেশারাইজ করতে দাও।' প্যানেলের উপর দ্রুত বার কয়েক চোখ বুলাল রানা। একটা গজ চোখে পড়ল, অ্যাটমাসফেরিক প্রেশার মাপে। এয়ার সিস্টেমের স্টপকক খুলতে কাঁটাটা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল। ফেসপ্লেট খুলে দেখো খানিকটা রিল্যাক্স হতে পারো কিনা।'

ইতস্তত একটা ভঙ্গিতে হেলমেট খুলল সুরাইয়া। শ্বাস নিতে তার কোন সমস্যা হচ্ছে না।

কলমটা খুলল রানা। নিবের মাথায় লেগে থাকা সরু তারটা টেনে লম্বা করল–ইঞ্চি দেড়েক লম্বা এরিয়াল। এরপর কলমের নীচের অংশটা ধরে দু'বার মোচড়াল। নর্থ কোরিয়ান স্যাটেলাইটের নাগাল পাবার জন্য যথেষ্ট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার তৈরি হলো।

টেলিগ্রাফিক কী অপারেট করে মেসেজ পাঠাচ্ছে রানা, তাড়াতাড়ি সাড়া পাবার জন্য কোড নয়; সহজবোধ্য বাংলা ব্যবহার করছে।

প্রায় কোন সময়ই লাগল না, এক মুহূর্ত পরই ঘরঘর করে উঠল থ্রি স্টারের স্পিকার।

'ফ্রিকোয়েন্সি বদলাও, মোড টোয়েনটি-থ্রিতে সেট করো, রানা।' পরিষ্কার বাংলায় বলা হলো কথাটা। গলার আওয়াজ চেনা চেনা লাগলেও, যান্ত্রিক বলে চিনতে পারল না রানা।

তাড়াতাড়ি ফ্রিকোয়েন্সি বদলে রেডিও রিঅ্যাডজাস্ট করল ও।

তারপর আবার ভেসে এল সেই একই কণ্ঠস্বর: বিধির কী অপূর্ব বিধান, আল্লাহর কী মধুর মহিমা! জীবনে অন্তত একবার হলেও পরম শত্রুর সাহায্য নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয় এসপিওনাজ জগতের জীবিত কিংবদন্তি মাসুদ রানাকে। কি, ঠিক বলিনি?'

'কে...কবীর চৌধুরী?' গলার আওয়াজ চিনতে পেরে রানার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। সর্বনাশ, শেষ পর্যন্ত বদ্ধ উন্মাদটার হাতে পড়তে যাচ্ছে ও?

'হ্যাঁ, কবীর চৌধুরীই–সেই আদি এবং অকৃত্রিম কবীর চৌধুরী। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, রানা। অন্তত স্বীকার করো যে বিপদে পড়েছ, তোমার সাহায্য দরকার।'

'বিপদে পড়েছি, জানি। কিন্তু এটা তুমি কোন্ আক্কেলে ধরে নিলে যে এত থাকতে তোমার কাছে সাহায্য চাইব? আমি বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছিলাম। ওদের সাহায্য নিয়ে ঠিকই পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব...'

'না, ওরা তোমাকে কোনই সাহায্য করতে পারবে না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'কারণ তোমরা যে ক্যাপসুলে রয়েছ, এই মডেলটা একদম নতুন। এটা সম্পর্কে বিসিআই এক্সপার্টরা কিছুই জানে না। শুধু ওরা কেন, নাসার ইঞ্জিনিয়াররা ছাড়া খুব কম লোকই জানে। আর জানি আমি। কারণ, আমিই ডিজাইন করেছি মডেলটার। বিলিভ ইট অর নট, নাসা আমার ডিজাইন চুরি করে নিজেদের বলে চালাচ্ছে।'

মনে মনে দমে গেল রানা। থ্রি স্টারের ডিজাইন সত্যি যদি কবীর চৌধুরীর করা হয়ে থাকে–সেটা অসম্ভব নয়–তা হলে খুব কঠিন বিপদেই পড়েছে ও। আর কেউ যেহেতু ওকে সাহায্য করতে পারবে না, কবীর চৌধুরী নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে ভারী নোংরা কোনও খেলা খেলতে চাইছে।

সাহায্য করবার কথা বলে মোটা টাকা মুক্তিপণ চাইবে সে। বিসিআই যদি টাকা দেয়, সেটা নিয়ে কেটে পড়বে। তার আগে, রিএন্ট্রির সময়, থ্রি স্টারকে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে সে ক্র্যাশ করাতে পারে, কিংবা রিমোটের সাহায্যে থ্রি স্টারে লুকিয়ে রাখা বোমাটা দিতে পারে ফাটিয়ে।

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটের কোণে। কবীর চৌধুরী ওকে সাহায্য করতে চায় আর কুমিরের চোখে জল–দুটো সমার্থক বলে মনে হচ্ছে। 'আসল কথাটা বলে ফেলো, কবীর চৌধুরী,' বলল রানা। 'কী চাও তুমি?'

'কিচ্ছু না, রানা, বিশ্বাস করো, কিচ্ছু চাই না। এটা আমার সাহায্য করতে চাওয়ার নিঃস্বার্থ প্রস্তাব। যদি জিজ্ঞেস করো কেন, তা হলে সত্যি কথাটা বলতে হবে। কিন্তু সেটা এত তেতো যে শুনতে তোমার ভাল লাগবে না, তাই বলছি না।'

'তবু আমি শুনতে চাই,' বলল রানা, গলায় শ্লেষ।

'সাহায্য করতে চাইছি এই জন্যে যে তা না হলে তুমি বাঁচবে না। কথাটা বিশ্বাস কোরো। আল্লাহ বাদে বর্তমান পরিস্থিতিতে

একমাত্র আমিই শুধু তোমাকে বাঁচাতে পারি।'

'তোমার এ-সব বড়াই আমি শুনতে চাই না। কারও সাহায্য কেন আমার দরকার, সেটা আগে বলো। আমি নিজে যদি কন্ট্রোল প্যানেল অপারেট করে বঙ্গোপসাগরে নামি, কে আমাকে বাধা দেবে?'

'সাবধান, রানা, সাবধান! ভুলেও সে রকম কিছু করতে যেয়ো না। সাংকেতিক চিহ্নগুলোর অর্থ যে জানে না, তার জন্যে কন্ট্রোল প্যানেলে হাত ছোঁয়ানো রীতিমত পাপ–আত্মহত্যার সামিল। থ্রি স্টারে বোমা আছে, ওটা ফেটে যেতে পারে।'

বোমা জুবিলিতেও ছিল, ছিল অক্সিজেন বটলগুলোর কাছে, অ্যাস্ট্রনটদের নাগালের মধ্যে। কবীর চৌধুরীর সঙ্গে কথা শুরু হবার পর থ্রি স্টারের সেই একই জায়গায় হাতড়েছে রানা, কিন্তু কিছু পায়নি। 'বোমা আছে? কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ভয় নেই, রানা। ইজরায়েলিরা ওই বোমা রিমোটের সাহায্যে ফাটাতে পারবে না,' আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'ওরা গ্রাউন্ড থেকে থ্রি স্টারকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারবে না। ওদের কোন সিগন্যালই থ্রি স্টারে পৌঁছাবে না, ফ্রিকোয়েন্সি এমনভাবে জ্যাম করে দিয়েছি।'

'তুমি বোধহয় সত্যি কথাটা এখনই বলতে রাজি নও, তাই না? তবে যদি ভেবে থাকো মুক্তিপণ বা কোন সুবিধে আদায় করবে, ভুলে যাও...'

'বিলিভ মি, ম্যান! এটা আমার নিঃস্বার্থ প্রস্তাব।'

'এ আমি বিশ্বাস করি না।'

শুনে রানাকে অবাক করে দিয়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'আসলে, এটাকে ঠিক প্রস্তাব বলা যায় না।'

'মানে?'

'মানে, এখানে তোমাকে কিছু বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে না। বলতে চাইছি, তুমি যদি আমার সাহায্য না চাও, তাও আমি

তোমাকে সাহায্য করব। হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই, রানা। কারণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমার খুব দরকার।'

'আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা তোমার দরকার?' রানা ঠিক বুঝতে পারছে না হাসবে না কাঁদবে।

'কি জানো, রানা–অন সেকেন্ড থট, তোমাকে বাঁচাতে চাওয়ার আমার এই ইচ্ছেটা নিঃস্বার্থও নয়। মনে হতে পারে আমি আবেগের বশে কথাটা বলছি, কিন্তু তা সত্যি নয়–তুমি যেমন আমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ, রানা, তেমনি আমিও তোমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ।'

'বলছিলে আমাকে সাহায্য করতে চাওয়ার পিছনে তোমার কী যেন স্বার্থ আছে। কী সেটা?' জানতে চাইল রানা।

'এক কথায় বলি?'

'বলো।'

গম্ভীর কণ্ঠে কবীর চৌধুরী বলল, 'আমার জীবনের বড় একটা মজা হলো তোমার উপকার করা–তুমি মরে গেলে সেই মজা থেকে আমি বঞ্চিত হব, তাই তুমি না চাইলেও তোমাকে আমি বাঁচাব।'

রানা ভাবল, এ তো দেখছি সত্যি পাগল!

'বোমাটা কোথায়?' প্রসঙ্গটা ভোলেনি ও।

'নতুন এই মডেলে বোমাটা এমন জায়গায় রাখা হয়েছে, কষ্টসাধ্য স্পেস ওয়াকিং ছাড়া সেটার নাগাল পাবে না অ্যাস্ট্রনটরা–তার আগে সার্চ করে বের করতে হবে কোথায় ওটা আছে। চিন্তা কোরো না, ওটা ফাটবে না।'

'তো, স্বার্থপর বন্ধু, এখন আমাকে কী করতে হবে?'

'কিছু না, শুধু কয়েকটা নির্দেশ ঠিক মত পালন করো,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কন্ট্রোল প্যানেলের বাঁ দিকে তাকাও। দেখো একটা তার আছে, লাল-সাদা ডোরাকাটা। ওটা ছিঁড়ে জোড়া লাগাও...'

কবীর চৌধুরীর প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে রানা। দশ মিনিটও পার হয়নি, কন্ট্রোল প্যানেলে রানার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো।

'রিএন্ট্রি নিয়ে কোন চিন্তা নেই,' ওকে অভয় দিয়ে বলল কবীর চৌধুরী। 'আমার ইচ্ছে নয় পুড়ে ছাই হয়ে যাও তোমরা। তবে আরও এক ঘণ্টা কক্ষপথে ঘোরো, তারপর নামিয়ে আনব। ভাল কথা, বঙ্গোপসাগরেই নামছ তোমরা। সুন্দরবনের ধারে।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা, 'তুমি জানলে কীভাবে কোথায় আছি আমি? আমার বিপদ, এটাই বা কে বলল তোমাকে?'

'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল না?' হাসল কবীর চৌধুরী। 'স্পেসে আমার যে একটা স্টেশন আছে, এটা তো একটা ওপেন সিক্রেট। এই মুহূর্তে উত্তর কোরিয়ান একটা খেয়াযানে রয়েছি আমি, রানা, তোমার...পঞ্চাশ মাইল পিছনে। শক্তিশালী টেলিস্কোপে থ্রি স্টারকে আমি দেখতেও পাচ্ছি।'

এক ঘণ্টা পর রিএন্ট্রি। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলেও, কোন রকম সমস্যা হলো না।

কবীর চৌধুরীর নির্দেশ মত কন্ট্রোল প্যানেল অপারেট করে থ্রি স্টারকে অনায়াসে বঙ্গোপসাগরে নামিয়ে আনল রানা।

'ওটা কী?' হ্যাচ খুলে বাইরে মাথা বের করেই চেঁচিয়ে উঠল সুরাইয়া।

তার পাশ থেকে মাথা তুলল রানাও। নোঙর ফেলা একটা ত্রিশ ফুটি ইয়ট ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

'কী সুন্দর! তোমার বন্ধুকে একটা ধন্যবাদ দেবে না?'

সুরাইয়ার কথায় যেন সংবিৎ ফিরে পেল রানা। খুদে রেডিওটা মুখের সামনে তুলে ডাকল ও, 'চৌধুরী?'

অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনেক আগেই যোগাযোগ কেটে দিয়েছে পাগল বৈজ্ঞানিক।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। কবীর চৌধুরী সম্ভবত ইচ্ছে করেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটা দিল না ওকে।

***